ষোড়শ অধ্যায়

গুপ্ত শাসন ব্যবস্থা, গুপ্ত যুগের সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থা
(Gupta Administration, Gupta Civilization, Social and Economic life in the Gupta Age)

গুপ্ত শাসন ব্যবস্থা (Gupta Administration) : গুপ্ত শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে গুপ্ত শিলালিপিগুলি, বিশেষতঃ দামোদরপুর লিপি, বসরা সীল লিপি, বিভিন্ন ভূমিপট্টলী, ফা-হিয়েনের বিবরণ প্রভৃতি হতে বহু তথ্য পাওয়া যায়। গুপ্তযুগে রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে কামন্দকের নীতিসার, স্মৃতিশাস্ত্রগুলি যথা, নারদ, যাজ্ঞ্যবল্ক স্মৃতি প্রভৃতি এবং মনুস্মৃতি বিশেষভাবে সাহায্য করে। কিন্তু রাষ্ট্রনীতির এই গ্রন্থগুলিতে তাত্ত্বিক আলোচনা বিশদভাবে করা হলেও, গুপ্ত শাসনের বাস্তব বিবরণ তেমন আলোচনা করা হয়নি। এজন্য এই গ্রন্থগুলি গুপ্ত শাসনের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে না।

গুপ্ত শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে উপাদান

গুপ্ত শাসন ব্যবস্থায় আপাতঃ দৃষ্টিতে রাজা ছিলেন সকল ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল। সেনাদল, কর্মচারীবৃন্দ তাঁরই নির্দেশে চলত। তিনি তাদের নিয়োগ করতেন এবং তাদের আনুগত্য ভোগ করতেন। রাজ্য শাসনের কাজে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাজাকে নিতে হত। প্রাদেশিক কর্মচারীরাও তাঁর দ্বারা নিযুক্ত হত এবং তাঁকে আনুগত্য দিত। তিনি ছিলেন রাজ্যের সর্বপ্রধান বিচারক। নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে তিনি আপীল শুনতেন। তিনি বংশানুক্রমিক অধিকারেশাসন করতেন। রাজ্যে তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করার মত কোন সাংবিধানিক ব্যবস্থা ছিল না।

রাজার ক্ষমতা

গুপ্ত সম্রাটরা তাঁদের এই উচ্চ ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আড়ম্বরপূর্ণ উপাধি নেন। যে ক্ষেত্রে মৌর্য সম্রাটরা কেবলমাত্র 'দেবতাদের প্রিয়' এই উপাধি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন, সে ক্ষেত্রে গুপ্তরা নিজেদের ঐশ্বরিক গুণযুক্ত, ঈশ্বরের অংশ বলে দাবী করতেন। তাঁরা নিজেদের "পরমদৈবত" "লোকধাম-দেব" ইন্দ্র, বরুণ, কুবেরের সমান বলে দাবী করতেন। রাজপদ বংশানুক্রমিক হলেও কখনও কখনও সম্রাট তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্থলে অন্য পুত্রকে উত্তরাধিকারী নির্বাচন করতেন।

রাজার উপাধি

গুপ্ত সম্রাটরা তাত্ত্বিক দিক থেকে অপরিসীম ক্ষমতা দাবী করলেও, হাতে-কলমে তাঁদের ক্ষমতা বেশী ছিল না। মৌর্য সম্রাটদের তুলনায় গুপ্ত সম্রাটদের ক্ষমতা ছিল বাস্তবে সীমিত। রাজা নিজেকে দেবতার সমকক্ষ বলে দাবী করলেও বাস্তবে তাঁকে বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হত। সামন্ত শক্তি রাজ ক্ষমতাকে কোণঠাসা করেছিল। রাজাকে দেশ শাসন ও যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্যে সামন্তদের সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হত। স্মৃতি শাস্ত্রগুলিতে আর মৌর্য যুগের মত রাজাকে দেবতার সৃষ্টি মনে করা হত না। দেবতার মত রাজা অভ্রান্ত একথাও ভাবা হত না। তবে স্মৃতি শাস্ত্র রাজাকে সম্মান জানাতে বলত। (২) মৌর্য যুগে শাসন ব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীভূত। একটি গ্রামে বা জেলায় কি ঘটছে, অশোক তাঁর গুপ্তচরদের দ্বারা তা জেনে নিতেন। কিন্তু গুপ্ত যুগে শাসন ব্যবস্থা ছিল বিকেন্দ্রীভূত। প্রদেশ ও বিষয় বা জেলা স্তরে প্রায় স্বায়ত্ব শাসন চলত। কেন্দ্রের মূলনীতির বিরোধিতা না করলে, প্রদেশের ও জেলার শাসনকর্তা বহু ক্ষমতা ভোগ করতে পারতেন। (৩) গুপ্ত যুগে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বৈদেশিক আক্রমণ চলার ফলে রাজার স্বৈর ক্ষমতা কার্যকরী হতে পারেনি। তাঁকে যুদ্ধের প্রয়োজনে স্থানীয় সামন্ত ও প্রাদেশিক শাসকদের ওপর বহু পরিমাণে নির্ভর করতে হত। (৪) রাজা ইচ্ছামত আইন তৈরি করতে পারতেন না। তাঁকে

রাজার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা

Scanned with CamScanner

চিরাচরিত প্রথা, ধর্ম শাস্ত্র, ব্রাহ্মণদের বিধান মেনে চলতে হত। (৫) মন্ত্রী পদ বংশানুক্রমিক। ফলে মন্ত্রীরা রাজার সঙ্গে অনেকটা ক্ষমতা ভাগ করে নিতেন। (৬) নীতি অনুসারে গ্রাম ও বিষয়গুলির শাসন স্থানীয় প্রতিনিধিদের সাহায্যে কর্মচারীরা ফলে রাজা হস্তক্ষেপ করার সুযোগ তেমন পেতেন না। (৭) গুপ্ত যুগে গ্রামগুলি ফলে বাড়তি উৎপাদন না করে গ্রামের প্রয়োজন-মাফিক লোকে উৎপাদন করত। বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেয়। গুপ্ত সম্রাটরা কর্মচারীদের বেতন না দিতে পেরে জমি বা দেন। কর্মচারীরা জমিতে অধিকার পেলে তারা খুবই শক্তিশালী হয়ে পড়ে। রাজার পক্ষে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না। (৮) রাজা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। অন্যায় কাজ করলে তাঁর বিরুদ্ধে জনসাধারণ বিদ্রোহ করতে পারত। (৯) রাজার মন্ত্রীরাও ছিলেন বংশানুক্রমিক। মন্ত্রী ও অমাত্যরা রাজার সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নিতেন। এই সকল কারণে অনেকে বলেন যে, গুপ্ত যুগে রাজার ক্ষমতা মৌর্য যুগের তুলনায় দুর্বল ছিল।

কেন্দ্রে রাজাকে শাসনের কাজে সাহায্যের জন্যে মন্ত্রী, যুবরাজ ও উচ্চ কর্মচারীরা ছিল। গুপ্ত যুগে মন্ত্রীরা এককভাবে রাজাকে পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সাহায্য দিত। কিন্তু মৌর্য যুগের মত

কেন্দ্রীয় প্রশাসন

কোন মন্ত্রী পরিষদ গুপ্ত যুগে ছিল না। কারও কারও মতে, মনুসংহিতায় মন্ত্রী পরিষদের আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু বেশীর ভাগ পণ্ডিত এই অগ্রাহ্য করেন। কারণ গুপ্ত যুগের কোন শিলালিপিতে মন্ত্রী পরিষদের উল্লেখ নেই। মন্ত্রী পদ এই যুগে বংশানুক্রমিক ছিল। উদয়গিরি গুহালিপি থেকে জানা যায় যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী বীর সেনের পিতাও মন্ত্রী ছিলেন। তিনি নিজেকে "অন্বয় প্রাপ্ত সচিব্য" বলেছেন। সন্ধি বিগ্রাহিক হরিসেনের পিতা ধ্রুবভূতিও মন্ত্রী ছিলেন। পশ্চিম ও মধ্য ভারতে গোপ্তৃ পদও বংশানুক্রমিক ছিল বলে জানা যায়। কখনও কখনও একই মন্ত্রী একাধিক পদ অধিকার করতেন।

গুপ্ত সম্রাটরা কেন্দ্রে বহু কর্মচারী নিয়োগ করতেন। মহাবলাধিকৃত ছিলেন সেনাপ্রধান। তাঁর অধীনে বিভিন্ন সামরিক পদ যথা, অশ্ব বাহিনীর প্রধান বা মহাশ্বপতি, হস্তীবাহিনীর প্রধান

বিভিন্ন বর্গের কেন্দ্রীয় কর্মচারী

মহাপীলুপতি প্রভৃতি থাকত। মহাদণ্ডনায়ক সম্ভবতঃ প্রধান সেনাপতি বা রক্ষী বাহিনীর প্রধান ছিলেন। তাঁর অধীনে অন্যান্য রক্ষীরা কাজ করত। মহাপ্রতীহার ছিলেন রাজপ্রাসাদের রক্ষী বাহিনীর প্রধান। সন্ধি-বিগ্রাহিক নামে একটি নতুন পদের কথা জানা যায়। এই কর্মচারী রাজাকে বৈদেশিক ব্যাপার, যুদ্ধ, সন্ধি প্রভৃতির বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। হরিষেণ ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের সন্ধি-বিগ্রাহিক। অক্ষ-পটলাধিকৃত নামে কর্মচারী সরকারী দলিলপত্র রচনা ও রক্ষা করতেন। এঁদের নীচে আরও নিম্নবর্গের কর্মচারী ছিল—যথা করণিক বা কেরাণী, দৌবারিক বা দরওয়ান প্রভৃতি।

গুপ্ত যুগে কেন্দ্রের সঙ্গে প্রাদেশিক সরকারের সংযোগ রাখার জন্যে কুমারমাত্য ও আয়ুক্ত নামে কর্মচারী নিযুক্ত হত। কুমারমাত্যের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। (১) রাজবংশের উচ্চ

কুমারমাত্য ও আয়ুক্ত

ক্ষমতাসম্পন্ন কুমারকে অমাত্য নিয়োগ করা হত; এজন্য কুমারমাত্য হতে পারে। (২) কুমার অথবা যুবরাজ অমাত্য হিসেবে কাজ করলে কুমারমাত্য হতে পারে। (৩) কারও কারও মতে, যুবরাজের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে কুমারমাত্য বোঝায়। (৪) কুমার অর্থাৎ অবিবাহিত অবস্থা থেকে যিনি মন্ত্রী আছেন তাঁকেও বলা যায়। (৫) আবার অনেকের মতে, যে মন্ত্রী বা অমাত্যের পিতা জীবিত ও তখনও অমাত্য পদে আসীন তাকেই কুমার অমাত্য বলা হত। দু ধরনের কুমারমাত্য ছিলেন। পরমভট্টারক স্থানীয় কুমার মাত্যরা সম্রাটের কাজে নিযুক্ত হত। অন্য কুমারমাত্যরা যুবরাজের কাজ করত। যাই হোক, কুমারমাত্যরা কেন্দ্রের বিশ্বাসভাজন কর্মচারী হিসেবে প্রাদেশিক ও জেলা বা বিষয়ে কাজ করত।

Scanned with CamScanner

আয়ুক্তরা জেলা ও শহরে কাজ করত। বিজিত রাজার রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়ার সময় জায়গা ও সম্পত্তির হিসেব আয়ুক্তরা রাখত।

গুপ্ত সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করে শাসন করা হত। এযুগে প্রদেশগুলির নাম ছিল দেশ বা ভুক্তি অথবা ভোগ। সাধারণতঃ গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রদেশগুলিকে ভুক্তি বলা হত—যথা তীরভুক্তি বা ত্রিহুত, পুন্ড্রবর্ধনভুক্তি, শ্রাবস্তীভুক্তি, অহিচ্ছত্রভুক্তি। দেশ নামধারী অঞ্চল ছিল পশ্চিম ভারতে যথা, সৌরাষ্ট্র দেশ, সুকুলি দেশ। গোপ্তৃ উপাধিধারী কর্মচারীরা দেশ শাসন করত, ভুক্তির শাসকের উপাধি ছিল উপারিক। কখনও কখনও রাজপরিবারের লোকেরা উপারিকের পদে কাজ করত। দামোদরপুর লিপি থেকে পুন্ড্রবর্ধনের উপারিক মহারাজপুত্র দেবভট্টারকের নাম শোনা যায়। ভুক্তিগুলিকে জেলা বা বিষয়ে ভাগ করা হত। গুপ্ত প্রাদেশিক শাসনে বিষয় ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এরকম অনেকগুলি বিষয় বা জেলার নাম জানা যায়, যথা কোটিবর্ষ বিষয় বা দিনাজপুর জেলা, অন্তর্বেদী বিষয় বা দোয়াব জেলা প্রভৃতি। বিষয়ের শাসনের জন্যে কুমারমাত্য, বিষয়াপতি, আয়ুক্ত প্রভৃতি কর্মচারীরা নিযুক্ত হত।

প্রাদেশিক শাসন বিভাজন ও কর্মচারী নিয়োগ

বিষয়ের শাসনকর্তা সাধারণতঃ প্রাদেশিক শাসনকর্তার দ্বারাই নিযুক্ত হত। তবে ইন্দোর লিপি থেকে জানা যায় যে, কখনও কখনও সম্রাট সরাসরি বিষয়ের শাসককে নিযুক্ত করতেন। অন্তর্বেদী বা দোয়াব বিষয়ের শাসনকর্তা সর্বনাগ ছিলেন সম্রাটের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে। দামোদরপুর লিপি থেকে জানা যায় যে, সাধারণতঃ উপারিকরাই বিষয়পতিদের নিয়ন্ত্রণ করত। আয়ুক্ত ও কুমারমাত্যরাও বিষয়ের শাসনে নিযুক্ত থাকলেও তারা কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করত। বিষয়পতিরা নগর পরিষদের সাহায্যে রাষ্ট্রীয় জমি বিক্রি করত।

বিষয় শাসন

গুপ্ত যুগে বিষয়ের শাসনে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটান হয়। বিষয়ের শাসন কাজে পরামর্শ দেওয়ার জন্য অধিকরণ বা পরিষদ নামে একটি সভা থাকত। এই পরিষদের নাম ছিল—অধিষ্ঠান-অধিকরণ। এই পরিষদ বা সভায় বিভিন্ন শ্রেণীর স্থানীয় প্রতিনিধি থাকত। সার্থবাহ প্রধান বা প্রধান ব্যবসায়ী, নগর শ্রেষ্ঠী, নিগম প্রধান, প্রথম কুলিক বা প্রধান কারিগর প্রভৃতি নিয়ে এই পরিষদ গঠিত হত। এরা পদাধিকার বলে সদস্য হত। বাকি সদস্যরা কিভাবে নিযুক্ত হত তা জানা যায় নি। স্থানীয় প্রতিনিধিদের মতামত নিয়ে শাসন পরিচালনার ফলে গুপ্ত শাসনের ভিত্তি বেশ মজবুত হয়। যে ক্ষেত্রে মৌর্য সম্রাটরা স্থানীয় মতামতের অপেক্ষা না রেখে তাঁদের কর্মচারীদের দ্বারা শাসন করতেন সে ক্ষেত্রে গুপ্ত শাসন ব্যবস্থা ছিল অনেক বেশী উদার ও প্রতিনিধিত্বমূলক। গ্রামের শাসনের ক্ষেত্রেও গুপ্ত যুগে প্রতিনিধিদের মতামত নেওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করা হয়।

নির্বাচিত পরিষদ

প্রাদেশিক স্তরে গুপ্ত যুগে কুমারমাত্য ও আয়ুক্ত ছাড়া আরও নানা ধরনের কর্মচারী ছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, প্রদেশের শাসনের দায়িত্ব ছিল উপারিক বা গোপ্তৃগণের হাতে। বিষয়ের শাসনের দায়িত্ব ছিল কুমারমাত্য ও আয়ুক্তদের হাতে। এছাড়া দণ্ডিক, দণ্ডপাণিক নামে পুলিশ বিভাগের কর্মচারী ছিল। পুষ্টপাল দলিল-পত্রাদি রচনা করত। তালবর ছিল সেনাপতি। বিনয়-স্থিতিস্থাপক সম্ভবতঃ ন্যায়নীতি রক্ষার দায়িত্ব বহন করত। সম্ভবতঃ প্রাদেশিক কর্মচারীরা মর্যাদা ও পদাধিকারে কেন্দ্রিয় কর্মচারী থেকে পৃথক ছিল। প্রদেশে প্রদেশে সামরিক বিভাগের দপ্তর গুপ্ত যুগে রাখা হত বলে জানা যায়। এ সম্পর্কে গুপ্তবংশীয় যুবরাজ গোবিন্দ গুপ্তের বৈশালী লিপি গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যান্য প্রাদেশিক কর্মচারী

Scanned with CamScanner

এই লিপিতে তীরভুক্তি বা ত্রিহুত বিষয়ের শাসনের জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়। এই কর্মচারীদের নাম ও পদমর্যাদা দেখে বোঝা যায় যে, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কর্মচারীর মধ্যে পার্থক্য ছিল। বিভিন্ন কর্মচারী বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করত।

গ্রামীণ শাসন

গুপ্ত যুগে গ্রামের শাসন ব্যবস্থায় গ্রামিকরা সরকারী কর্মচারী হিসেবে কাজ করত। গ্রামের প্রধান বা মোড়লকে বলা হত মহত্তর বা ভোজক। এই ব্যক্তি গ্রাম শাসনে গ্রামিককে সাহায্য করত। গ্রামসভা বা মহাসভার সাহায্যে গ্রামিকরা পতিত জমি, কর্ষিত জমির আলাদা তালিকা করত, জমি মাপ করত, পথ ঘাট, বাজার, মন্দির, পুস্করিণী প্রভৃতির পরিচালনার ব্যবস্থা করত।

বিচার ব্যবস্থা

গুপ্ত বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায় যে, গ্রামসভাগুলি প্রধানতঃ গ্রামের বিচারের নিষ্পত্তি করত। বিষয় ও প্রাদেশিক শহরে সরকারী আদালত ছিল। এই আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে রাজার কাছে আপীল করা যেত। ফা-হিয়েন গুপ্ত ফৌজদারী আইনের উদারতার কথা বলেছেন। রাজদ্রোহ ছাড়া অন্য অপরাধে অঙ্গচ্ছেদ করা হত না। লোকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত হয়ে স্বাধীন জীবন যাপন করত। রাষ্ট্রের খরচায় রাস্তাঘাট, পুল, বাঁধ ইত্যাদি তৈরি করা হত। লোকে যাতে ন্যায় পথে চলে এটা দেখবার জন্যে বিনয়-স্থিতিস্থাপক নামে কর্মচারীরা চেষ্টা চালাত।

রাজস্ব নীতি

গুপ্ত রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায় যে, (১) জমির ফসল থেকে রাজা $\frac{১}{৪}$ বা $\frac{১}{৬}$ ভাগ রাজস্ব পেতেন। এর নাম ছিল "ভাগ"। (২) কর্মচারীদের বেতনের ওপর কর ধার্য করা হত। এই করের নাম ছিল ভোগ। (৩) শুল্ক অর্থাৎ বাণিজ্য ও শিল্প-দ্রব্য হতে প্রত্যয় বা আবগারী কর আদায় করা হত। (৪) জঙ্গল, খনি, ফেরিঘাট, বাজার হতে কর আদায় করা হত। ডঃ ঘোষালের মতে, গুপ্ত যুগে কৃষক জমি চাষ করলেও জমির মালিকানা ছিল রাজার। দান-বিক্রয় করতে হলে রাজার সম্মতির দরকার হত। অবশ্য অনেকে এই ব্যাখ্যা মানেন না। তাঁদের মতে, জমির মালিকানা ছিল কৃষকের। কিন্তু জমি দান-বিক্রয় করতে হলে স্থানীয় পরিষদ ও রাজার সম্মতিক্রমে তা করা যেত। রাজা কিছু কর্মচারীদের নগদ বেতন দিলেও, বেশীর ভাগ বেতনের বদলে জমি বন্দোবস্ত দিতেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের যে অংশ সম্রাটের প্রত্যক্ষ শাসনে ছিল তার সম্পর্কে উপরে আলোচনা করা হল। এই অঞ্চলের বাইরে সামন্ত রাজাদের শাসিত অঞ্চল ও গণরাজ্য ছিল। এই অঞ্চলগুলি স্বায়ত্ব শাসন ভোগ করত। সম্রাটের প্রতি অধীনতা স্বীকারের বিনিময়ে তারা স্বায়ত্ব শাসন পেত। তারা সম্রাটের অনুমতি ছাড়া ভূমিপট্টলী দান করত। সম্রাটকে এরা কর দিত।

সমালোচনা

গুপ্ত শাসন ব্যবস্থার প্রশংসার দিক ছিল এর বিকেন্দ্রীকরণ নীতি এবং প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা। এর দ্বারা স্থানীয় অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করা সহজ ছিল। দূরবর্তী সম্রাটের সঙ্গে স্থানীয় লোকেদের প্রতিনিধি সভার দ্বারা সংযোগ ঘটত। মৌর্য সম্রাটদের মত গুপ্তচরদের দ্বারা খবর যোগাড় করতে হত না। শাসন ব্যবস্থা উদারপন্থী হওয়ার ফলে লোকে স্বাধীনতা ও স্বচ্ছন্দতার মধ্যে দিন কাটাত। তাদের দৈনন্দিন জীবনে সরকার হস্তক্ষেপ করত না। বিশেষভাবে কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে সমন্বয় করা হয়েছিল। এই শাসন ব্যবস্থার দূর্বল দিক ছিল যে, বিকেন্দ্রীকরণের ফলে আঞ্চলিকতা ও বিচ্ছিন্নতা প্রবল হতে থাকে। গুপ্ত কর্মচারীদের জমি দেওয়ার ফলে সামন্ত প্রথার প্রবলতা বাড়ে। ক্রমে সামন্তরা শক্তিশালী হয়ে স্বাধিকার-প্রমত্ত হয়ে ওঠে। গুপ্তযুগে নগর অপেক্ষা গ্রাম ও বিষয়গুলি প্রাধান্য পায়। প্রাচীন নগরগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ফা-হিয়েনের বর্ণনা পড়লে মনে হয় গুপ্তযুগ প্রকৃতই সুবর্ণ যুগ ছিল। কারণ শাসনব্যবস্থা ছিল উদার ও বিকেন্দ্রিত।

Scanned with CamScanner

সর্বশেষে, মৌর্য যুগে সাম্রাজ্যের একান্ত প্রত্যন্ত প্রদেশ ছাড়া আর কোন অঞ্চলে সামন্ত বা করদ প্রথা স্বীকার করা হত না। গুপ্ত সাম্রাজ্যের একটি বৃহৎ অংশ করদ রাজ্য নিয়ে গঠিত ছিল। এখানে করদ রাজা স্বায়ত্ব-শাসনের অধিকার ভোগ করতেন। মৌর্য ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল গুপ্তদের অপেক্ষা কঠোর। মৌর্য সম্রাটরা সীতা জমি হতে ফসলের $\frac{১}{৪}$ ভাগ নিতেন; এক্ষেত্রে গুপ্ত সম্রাটরা $\frac{১}{৬}$ ভাগ নিতেন। মোট কথা, গুপ্ত যুগের শাসন ছিল অনেকটা ঢিলেঢালা ও উদারতান্ত্রিক।

করদ রাজ্য প্রথা: সামন্ত প্রথা

গুপ্তযুগকে স্বর্ণযুগ বলা সঙ্গত কিনা? (Whether the Gupta Age can be called a Golden Age) : গুপ্ত যুগের উদারপন্থী শাসনব্যবস্থা, সাহিত্য, শিল্পের অসাধারণ অগ্রগতি, জনসাধারণের স্বচ্ছলতা ও দেশে শান্তি লক্ষ্য করে কোন কোন ঐতিহাসিক এই যুগকে স্বর্ণযুগ বলেন। বার্ণেট নামে এক ইওরোপীয় ঐতিহাসিক গুপ্তযুগকে প্রাচীন গ্রীসের পেরিক্লীয় যুগের (Periclean Age) সঙ্গে তুলনা করেছেন।

স্কন্দগুপ্তের শাসনকাল পর্যন্ত কোন বড় ধরনের বৈদেশিক আক্রমণ গুপ্ত যুগে ঘটেনি। ভারতের নিরাপত্তা ও শান্তি দীর্ঘকাল মোটামুটিভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল। স্কন্দগুপ্তের আমলে হূণ আক্রমণ ঘটলেও তিনি তা প্রতিহত করে আরও ৫০ বছর ভারতকে নিরাপদ রাখেন। এই কৃতিত্ব বড় কম ছিল না। গুপ্ত শাসনের একেবারে শেষদিকে পুনরায় হূণ আক্রমণ ঘটে। সুতরাং দীর্ঘকাল গুপ্ত সম্রাটরা ভারতকে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে সুরক্ষা করেন।

গুপ্তযুগে ভারতের নিরাপত্তা

গুপ্ত শাসনব্যবস্থা সাম্রাজ্যে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও সংহতি রক্ষায় বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। মৌর্যযুগের অতি-কেন্দ্রীকতা ত্যাগ করে গুপ্ত সম্রাটরা কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করেন। সাম্রাজ্যের ঐক্যকে বিনষ্ট না করে, তাঁরা প্রদেশ ও জেলা স্তরে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করেন এবং স্থানীয় প্রতিনিধি সভা গঠনের ব্যবস্থা করেন। গুপ্ত শাসনব্যবস্থার এই দিকটি ছিল নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল। এর ফলে সাম্রাজ্যের সংহতি দৃঢ় হয় এবং স্থানীয় ঔপজাতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হলে জনসাধারণ সন্তুষ্ট হয়। ভারতের মত একটা বিশাল দেশের পক্ষে এককেন্দ্রিক শাসনের দুর্বলতা তাঁরা বিশেষভাবে বুঝেছিলেন।

সাম্রাজ্যে সংহতি ও ঐক্য

গুপ্ত শাসন ব্যবস্থার চরিত্র ছিল উদার। ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, জনসাধারণ স্বাধীন ও অবাধভাবে জীবন-যাপন করত। কোন গুপ্তচর বা সরকারী কর্মচারী তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও দৈনন্দিন জীবনের শান্তিকে বিঘ্নিত করত না। ফৌজদারী আইন ছিল মৃদু; নিতান্ত বিশেষ অপরাধ ছাড়া অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদ করা হত না। প্রাণদণ্ড খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। ফা-হিয়েনের নিরপেক্ষ রচনার তথ্য হতে গুপ্ত যুগকে সুবর্ণ যুগ বলার উপাদান পাওয়া যায়।

উদারপন্থী শাসন ব্যবস্থা

গুপ্ত যুগের ধর্ম ব্যবস্থাও প্রশংসনীয় ছিল। যদিও এ যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটেছিল বলা হয়, যদিও সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, যদিও গুপ্ত যুগে ব্রাহ্মণরা প্রাধান্য পান তথাপি গুপ্ত সম্রাটরা ধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। তাঁরা অন্য ধর্মগুলি বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্মের প্রতি যথোচিত উদারতা ও সাহায্য করতেন। সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ সমুদ্রগুপ্তের কাছে দূত পাঠিয়ে বোধগয়ায় বিহার নির্মাণ করতে চাইলে তিনি অনুমতি দেন ও এই বিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্যে কয়েকখানি গ্রাম দান করেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা গুপ্ত সম্রাটরা করতেন। গুপ্ত সম্রাটরা জৈনধর্মের

পৌরাণিক হিন্দুধর্ম ও ধর্মসহিষ্ণুতা

বিশেষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা না করলেও সাধারণ লোক ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে বিশেষতঃ পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্মের জনপ্রিয়তা ছিল। গুপ্ত যুগে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য বাড়লেও তা বৈদিক হিন্দুধর্ম ছিল না। তা ছিল লৌকিক ধর্ম। একদা বৈদিক ধর্মে যাঁদের অনার্য ও লৌকিক দেবতা বলে ঘৃণা করা হত যথা, শিব, কালী, কার্তিক, লক্ষ্মী, গুপ্ত যুগে তাঁরাই বৈদিক দেবতা ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ প্রভৃতিকে স্থানচ্যুত করে জনসাধারণের হৃদয়ে স্থান করে নেন। গুপ্তযুগে বৈষ্ণবধর্মের জনপ্রিয়তা বাড়ে। সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বৈষ্ণব ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। শৈব ধর্মেরও গুপ্ত যুগে অগ্রগতি হয়। ভারবির 'কিরাতার্জ্জুনীয়ম' কাব্য শিবের জনপ্রিয়তার প্রমাণ। বায়ু ও মৎস্য পুরাণে শিবের প্রতি বিশেষ ভক্তির প্রকাশ দেখা যায়। গুপ্তযুগে বহু শিব মন্দির তৈরি হয়। গুপ্তযুগে মূর্তিপুজোর জনপ্রিয়তা বাড়ে। বৈদিক যজ্ঞের ও বৈদিক দেবতার পুজোর প্রথা জনপ্রিয়তা হারায়।

গুপ্ত যুগের সাহিত্যের ও দর্শনের চর্চার অগ্রগতি পরবর্তী প্রজন্মকে বিস্মিত করেছে। এ যুগের সৃজনী প্রতিভা যেন সহস্র শীর্ষ হয়ে সাহিত্য, দর্শন, শিল্পের ক্ষেত্রে বিকশিত হয়েছিল। শুধুমাত্র এই কারণে গুপ্ত যুগ সুবর্ণ যুগের আখ্যা পেতে পারে। প্রাচীন ভারতের কবি সার্বভৌম কলিদাস তাঁর কাব্য ও নাটক রচনা দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গণে প্রথম সারিতে স্থান করে দেন। ভারবি, শূদ্রক, বিশাখদত্ত প্রভৃতি সাহিত্যিক ছিলেন গুপ্ত যুগের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি। দর্শনশাস্ত্রে গুপ্তযুগের চিন্তাবিদদের মধ্যে মৌলিক চিন্তার প্রভাব লক্ষণীয়। গৌড়পাদের বেদান্ত দর্শন, আসঙ্গের নাগাচার শাস্ত্র, ঈশ্বর-কৃষ্ণের সাংখ্যকারিকের কথা এ প্রসঙ্গে বলা যায়। অমর সিংহের কাব্যের আকারে সংস্কৃত অভিধান, বাগভট্টের চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থ, বরাহ মিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্ত, আর্যভট্টের আহ্নিক ও বার্ষিক গতির তত্ত্ব গুপ্ত মনীষার পরিচয় দিচ্ছে।

সাহিত্য, দর্শনের অগ্রগতি

শিল্প অর্থাৎ স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় গুপ্ত যুগ ছিল অসাধারণ সৃজনশীল। গুপ্ত যুগেই মন্দির স্থাপত্যের প্রথম বিকাশ হয়; তিন মহলা, তিন প্রস্থে মন্দির নির্মাণের স্থাপত্য রীতির উদ্ভাবন হয়। অজয়গড়ের পার্বতী মন্দির, সাতনার একলিঙ্গ মন্দির, ভিতারগাঁওয়ের ইটের তৈরি মন্দির এর উদাহরণ। গুপ্ত যুগের ভাস্কর্য গন্ধার শিল্পের স্থূলত্ব, অমরাবতীর ইন্দ্রিয়তাবাদ অতিক্রম করে এক অতীন্দ্রিয় স্তরে পৌঁছেছিল। দেবদেবীর ওষ্ঠাধরে স্মিত হাস্য হৃদয়ে দিব্যজ্ঞানের উদ্ভাসের পরিচয় দেয়, অর্ধনিমীলিত চক্ষু প্রজ্ঞা বা বোধির সাক্ষ্য দেয়। দেব-দেবী মূর্তির হাতের আঙুলগুলি চাঁপার পাপড়ির মত বাঁকা, বাহু মনাসের মত, চক্ষু হরিণী বা সফরীর মত; দেবতার স্কন্ধ সিংহের কাঁধের মত। এযুগের চিত্রশিল্পের উদাহরণ অজন্তার প্রাচীরের গায়ে আঁকা আছে। গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রাগুলির শিল্প সুষমা ছিল চোখ জুড়ানো। সকল দিক মিলিয়ে গুপ্ত যুগকে এজন্য সুবর্ণযুগ বলা হয়।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অগ্রগতি

গুপ্ত যুগকে সুবর্ণ যুগ বলা সঙ্গত কিনা এ সম্পর্কে দ্বিতীয় চিন্তা আরম্ভ হয়েছে। গুপ্ত শাসন ব্যবস্থার প্রশংসার দিকগুলি থাকলেও দুর্বল দিকগুলির কথা বলা দরকার। গুপ্ত সাম্রাজ্য এই দুর্বলতার জন্যে ভেঙে যায়। প্রদেশে ও জেলায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করার ফলে স্থানীয় শাসনকর্তারা ক্ষমতালোভী হয়ে পড়ে। কেন্দ্রে প্রবল প্রতাপ সম্রাট না থাকায় তারা ক্রমে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে। তাছাড়া বংশানুক্রমিক পদে নিয়োগের নীতি ও বেতনের পরিবর্তে ভূমি দানের নিয়ম চালু হলে সামন্ত প্রথার উদ্ভব হয়। এই সামন্তশ্রেণী শীঘ্রই স্বাধিকার-প্রমত্ত হয়ে সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংহতি ভেঙে ফেলে। যশোধর্মণ ছিলেন এইরূপ এক প্রতাপশালী সামন্ত রাজা। বলভীর মৈত্রক বংশ

গুপ্ত শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা

Scanned with CamScanner

কনৌজের মৌখরি বংশও এইরূপ সামন্ত ছিল।

গুপ্ত যুগের স্বর্ণমুদ্রাগুলি এ যুগের অর্থনৈতিক উন্নতির পরিচয় দিলেও এই আপাতঃ স্বচ্ছলতার অন্তরালে ছিল জনসাধারণের অপরিসীম দারিদ্র্য। শাসকশ্রেণী, সামন্ত ও অভিজাত শ্রেণী হয়ত স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করত। সাধারণ লোকে তার অধিকারী ছিল না। দৈনন্দিন কেনা-বেচার জন্যে দরকার ছিল রৌপ্যমুদ্রা। গুপ্ত যুগে রৌপ্যমুদ্রার দুর্লভতা প্রমাণ করে যে, সাধারণ লোকের হাতে বেশী অর্থ ছিল না। ফা-হিয়েন বলেছেন যে, লোকে টাকার অভাবে কড়ি দিয়ে জিনিষপত্র কেনা-বেচা করত। এর ফলে সাধারণ বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সাধারণ লোকেরা ইচ্ছামত দরকারী জিনিষ কিনতে পারত না। সম্ভবতঃ, রৌপ্য মুদ্রার অভাবের জন্যেই সরকারী কর্মচারীদের নগদ বেতন না দিয়ে জমি দেওয়া হত।

জনসাধারণের দারিদ্র্য

যদিও ফা-হিয়েন গুপ্ত যুগের সমৃদ্ধির কথা বলেছেন তবুও তিনি উল্লেখ করেছেন যে, দেশের বড় বড় শহরগুলি ধ্বংস হতে বসেছিল। পাটলিপুত্র নগরী ধ্বংসের মুখে এসেছিল। শ্রাবস্তী, কপিলাবাস্তু, রাজগৃহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। প্রাচীন বাণিজ্য পথগুলির আর কোন গুরুত্ব ছিল না। সুতরাং গুপ্ত যুগের সমৃদ্ধি উচ্চ অভিজাত ও সামন্তশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সাধারণ লোকের মধ্যে তা তেমনভাবে ছিল কিনা সন্দেহ। কালিদাসের নাটকে রাজ দরবারের যে বিলাসিতার চিত্র দেখা যায় তা দেশের সামগ্রিক সমৃদ্ধির পরিচয় দেয় না। মূলতঃ গুপ্ত যুগের স্বচ্ছলতা অনেক পরিমাণে সামন্তশ্রেণীর শোষণ ও ধনী বণিকদের অর্থ কৌলিন্যের ওপর নির্ভর করত। জাতির সকল স্তরে এই স্বচ্ছলতা ছড়িয়ে পড়েনি বলে অনেকে মনে করেন।

নগরগুলির ধ্বংসোন্মুখিতা

গুপ্ত যুগের সাহিত্য ও শিল্প ছিল অভিজাত শ্রেণীর বিনোদনের জন্যেই সৃষ্ট। সমাজের উচ্চশ্রেণীর ভাষা ছিল সংস্কৃত। এই ভাষাতেই সাহিত্য রচিত হয়। লোকের মুখের ভাষা প্রাকৃত ছিল অবহেলিত। নাটকের বিষয়বস্তু ছিল প্রধানতঃ রাজাদের যুদ্ধযাত্রা, প্রমোদ ও কৈতব। উচ্চশ্রেণীর লোকের বিনোদনের জন্যে নাটক ও নৃত্যের পরিকল্পনা করা হয়। সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা নিয়ে কোন নাটক রচিত হয়নি। এমন কি সংস্কৃত নাটকগুলি ছিল মিলনান্তক। কারণ উচ্চশ্রেণীর লোকের মনোরঞ্জনের জন্যে তার দরকার ছিল। বিয়োগান্ত নাটক এ যুগে লেখা হয়নি।[১] এ সম্পর্কে কোশাম্বির মত প্রণিধানযোগ্য। কোশাম্বি বলেন যে, গুপ্ত যুগে সমাজের উচ্চতর শ্রেণী নিম্নশ্রেণী থেকে নিজেদের পার্থক্য রাখার জন্যে সাহিত্যে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার করেন। উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে নতুন যে ধনিক শ্রেণীর সৃষ্টি হয় তারা নিজেদের আভিজাত্য রক্ষার জন্যে সংস্কৃত ব্যবহার করে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা প্রধানতঃ ধর্ম ও প্রেমের বিষয়ে আগ্রহ দেখাত। তাই সাহিত্যে তারই প্রভাব দেখা যায়। এই যুগের সাহিত্যের মতই ভাস্কর্যেও ইন্দ্রিয়-প্রবণতা দেখা যায়। গুপ্ত শিল্প, ভাস্কর্যেও উচ্চশ্রেণীর লোকের রুচির প্রতি আনুগত্য দেখা যায়। সাধারণ লোকের জীবন নিয়ে কোন মূর্তি তৈরি বা চিত্র আঁকা হয়েছে বলে জানা যায়নি। গুপ্ত সমাজে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে জাতিভেদ প্রথা বেশ দৃঢ় হয়। সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেণী অধিকাংশ সুবিধার ভাগী হয়।

উচ্চশ্রেণীর জন্যে বিনোদন সাহিত্য : লোকো সংস্কৃতির অভাব : ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও জাতিভেদ প্রথা

এ সকল ত্রুটি সত্ত্বেও গুপ্ত যুগের সামগ্রিক অগ্রগতি ছিল অসাধারণ। শাসনব্যবস্থা, সাহিত্য, শিল্প সকল ক্ষেত্রে গুপ্ত যুগের মনীষার অসাধারণ ও বহুমুখী বিকাশ ঘটেছিল।

Scanned with CamScanner

গুপ্ত যুগের সভ্যতা (The Civilization of the Gupta Age) : গুপ্ত যুগের সভ্যতার অসাধারণ অগ্রগতি লক্ষ্য করে বারনেট (Barnett) এই যুগকে প্রাচীন গ্রীসের পেরিক্লীয় যুগের সঙ্গে তুলনা করেছেন[১]। অনেকেই গুপ্ত যুগের সভ্যতার অভূতপূর্ব অগ্রগতির জন্যে এক ধ্রুপদী যুগ (Classical Age) বলে অভিহিত করেছেন। স্মিথ ইংলণ্ডের এলিজাবেথীয় যুগের সঙ্গে গুপ্ত যুগের তুলনা করেছেন। গুপ্ত যুগ সম্পর্কে এই মুগ্ধতা বা কাব্যময় প্রশংসার কোন কোন ঐতিহাসিক এখন সমালোচনা করেন। রোমিলা থাপার প্রভৃতি গবেষিকাদের মতে, গুপ্ত যুগের সভ্যতার স্বকীয়তা ও শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েও বলা যায় যে, এটা ছিল দরবারী সভ্যতা (Court culture)। গুপ্ত যুগ ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ।

গুপ্ত সভ্যতার প্রকৃতি বিচার : লোকো সংস্কৃতির অভাব

সমাজে ও রাষ্ট্রে সকল ক্ষমতা এবং মর্যাদা ছিল উচ্চশ্রেণী, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেণীর হাতে। তারাই ছিল সমাজের প্রভু। সমাজের নিম্নশ্রেণী যে সম্পদ কৃষিক্ষেত্রে ও শিল্পে, বাণিজ্যে উৎপাদন করত তার সিংহভাগ তারাই ভোগ করত। এই উচ্চ শ্রেণীর বিনোদনের জন্যেই গুপ্ত সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছিল। তাই লোকের মুখের ভাষা প্রাকৃতকে ছেড়ে কাব্যময়, অলঙ্কার-বহুল সংস্কৃতে সাহিত্য রচনা আরম্ভ হয়। এই সাহিত্যের রসাস্বাদন একমাত্র উচ্চশ্রেণীর বিদগ্ধ লোকেরাই করতেন। গুপ্ত যুগের উৎকৃষ্ট সংস্কৃত নাটকগুলির সবই মিলনান্তক। যেহেতু রাজদরবারে ও অভিজাতদের মনোরঞ্জনের জন্যেই এই সকল নাটক লিখিত হয় সেজন্য এগুলি উচ্চশ্রেণীর রুচির উপযোগী করে লেখা হয়েছিল। বিয়োগান্ত নাটক বা সাধারণ লোকের জীবন, তাদের দুঃখ-বেদনা নিয়ে কোন নাটক লেখা হয়নি। গুপ্ত যুগের শিল্প-ভাস্কর্যও ছিল উচ্চশ্রেণীর রুচির দিকে লক্ষ্য রেখে রচিত। (বিশদ আলোচনা আগের স্বর্ণযুগ সম্পর্কে আলোচনা পৃঃ ২৮৩, দ্রষ্টব্য)।

কোন কোন ঐতিহাসিক উপরের মতের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, গুপ্ত যুগের সংস্কৃত নাটকগুলির গঠনভঙ্গি এমন ছিল যে তা ছিল একাধারে মিলনান্তক ও বিয়োগান্তক। গ্রীক

সংস্কৃত ভাষার সপক্ষে যুক্তি : সংস্কৃত নাটকের পক্ষে অভিমত

নাটকের মত আলাদা ভাগে বিয়োগান্ত নাটক লেখার প্রবণতা গুপ্ত যুগের কবিদের ছিল না। একই নাটকের অঙ্গে মিলন, বিরহ, বিয়োগ গ্রথিত করা হত এবং এটাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ মানুষের জীবনে এরূপই ঘটে। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, বিক্রোমোর্বশীম্ প্রভৃতি নাটকে ট্র্যাজেডি বা বিয়োগান্ত নাটকের রস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, গুপ্ত যুগেই সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য চর্চার প্রথম সূত্রপাত হয়নি। মৌর্যযুগে প্রাকৃত ভাষার প্রাধান্য সংস্কৃত কিছুটা পিছিয়ে পড়ে যায়। কিন্তু শুঙ্গ-কুষাণ যুগ হতে সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য চর্চা প্রাধান্য পায়। গুপ্ত যুগে সেই ধারা অব্যাহত ছিল। তৃতীয়তঃ, প্রাকৃত ভাষার চর্চা গুপ্ত যুগে একেবারে লোপ পাইনি। তবে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংস্কৃত ভাষার চর্চাই প্রাধান্য পায়।

গুপ্ত যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান হলেও, বৈদিক দেব-দেবীরা গুপ্ত যুগে তাঁদের আগের মর্যাদা হারান। বৈদিক দেবতা ইন্দ্র, মিত্র, বরুণের স্থলে লৌকিক দেবতা দুর্গা, শিব, কালী, কার্তিকেয় প্রাধান্য পান। এই নতুন দেবতাদের ঐশ্বরিক মহিমা প্রতিষ্ঠা করতে পুরাণকে পুনরায়

গুপ্ত যুগের ধর্ম চিন্তা

লিখতে হয়। কিন্তু একথা স্বীকার্য যে, এই লৌকিক দেব-দেবীদের অনেকেই ছিলেন অনার্যদের দেবতা। গুপ্ত যুগে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হয়। তবে পুরাণে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের বিশদ ব্যাখ্যা ও স্বীকৃতি দেখা যায়নি। বিষ্ণু

১. "The Gupta period was in the annals of Classical India almost what the Pericle Age is in the history of Greece."

পুরুষ তথা বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যা ভগবদ্‌গীতায় পাওয়া যায়। গুপ্তযুগে যে লৌকিক বা পৌরাণিক হিন্দুধর্মের বিকাশ ঘটে তার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল :—(১) দেবদেবীর মূর্তিপুজো এই যুগে প্রাধান্য পায়। নিরাকারের স্থলে সাকারের উপাসনা জনপ্রিয় হয়। (২) লৌকিক দেবতাদের জনপ্রিয়তার কথা আগেই বলা হয়েছে। (৩) যজ্ঞ ও আহুতির পরিবর্তে পুজো এবং দেবালয় গুপ্তযুগে প্রাধান্য পায়। (৪) দেবতারা সপরিবারে পূজিত হতে থাকেন; যথা শিবের সঙ্গে পার্বতী, নারায়ণের সঙ্গে লক্ষ্মী। অনেক সময় শুধুমাত্র দেবীরাও পূজিতা হন; যেমন দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী। (৫) বৈদিক দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা কোন কোন অঞ্চলে উত্তর পশ্চিম ভারতে পূজিত হতেন। তবে সূর্য তাঁর নিজ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকেন। ভবিষ্য পুরাণ, বরাহ পুরাণ প্রভৃতিতে সূর্য পুজোর কথা ও সূর্যের মহিমার কথা বলা হয়েছে। পশ্চিম ভারতের নানা স্থানে, বিশেষ সূর্যমন্দিরের কথা জানা যায়। অনেকে মনে করেন যে, শক-পার্থিয় প্রভাবের ফলে সূর্যপুজোর প্রচলন বাড়ে। ভূমরের শিবমূর্তি কণিষ্কের মূর্তির মত চোগা-চাপকান, মাথায় শিরস্ত্রাণ ও পায় পাদুকা পরিহিত। এটি বৈদেশিক প্রভাবের ইঙ্গিত দেয়। অবশ্য দক্ষিণী সূর্যমূর্তিগুলি ভারতীয় রীতিতে নগ্ন গাত্র, নগ্ন পদ। (৬) গুপ্ত যুগে শক্তিপুজোর প্রাধান্য দেখা যায়। গুপ্তযুগের প্রধান দেবতা শিব ও বিষ্ণুর পরেই শক্তিরূপিনী দুর্গার স্থান। তাঁকে দুভাবে কল্পনা করা হয়। ভয়ঙ্করী, ভীমা, রুদ্রাণী-রূপে তিনি হলেন চামুণ্ডা, কালী, করালী, ভৈরবী; আর শান্ত মাতৃরূপে উমা, দুর্গা, পার্বতী, ভবানী, চণ্ডিকা। ক্রমে শক্তিরূপিনী দুর্গা শিবের সঙ্গে যুক্ত হন এবং গণেশ ও কার্তিকেয় তাঁদের সন্তান হিসেবে দেব পরিবারে যুক্ত হন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের কল্পনায় শক্তিরূপিনী দুর্গার হাতে মহিষাসুর ও অন্যান্য অসুর নিহত হন।

গুপ্ত যুগে লৌকিক বা পৌরাণিক ধর্ম ছাড়া বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম বিদ্যমান ছিল। ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে গন্ধার, মথুরা প্রভৃতি স্থানে তিনি বহু বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সাক্ষাৎ পান। গৃহস্থরা স্তূপ বা চৈত্য প্রতিষ্ঠা করে পুজো করত। যদিও ফা-হিয়েন হীনযানী বৌদ্ধদের কথা বলেছেন, তবে মথুরা ও সারনাথের ভাস্কর্য দেখে অনুমান করা যায় যে, গুপ্ত যুগে মহাযানী বৌদ্ধরা প্রাধান্য লাভ করে। নালন্দা বিহার ছিল বৌদ্ধধর্মতত্ত্ব প্রচারের প্রধান কেন্দ্র। গুপ্ত সম্রাটরা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠ-পোষকতা করতেন। বুধগুপ্ত, তথাগত গুপ্ত সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন। তবে হূণ আক্রমণে বৌদ্ধ বিহারগুলির বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। হিউয়েন সাং যখন সপ্তম খ্রীঃ ভারতে আসেন তখন বৌদ্ধধর্মের পতনশীল অবস্থা দেখা দেয়।

তুলনামূলকভাবে গুপ্তযুগে জৈনধর্মের বিশেষ প্রসার ঘটে। তবে গুপ্ত-পূর্ব যুগে জৈনদের মধ্যে বহু সম্প্রদায়ের উদ্ভব হওয়ায় জৈনদের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়। উত্তর ভারতে বিশেষতঃ মগধে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমলেও দক্ষিণ ভারতে এই ধর্মের বিশেষ বিস্তার ঘটে। উত্তরে গুপ্ত-সম্রাটদের আনুকুল্য জৈনধর্ম না পেলেও দক্ষিণের রাজাদের সাহায্য এই ধর্ম পায়। মহীশূরের গঙ্গ রাজবংশের নাম এই প্রসঙ্গে করা যায়। তামিল ভাষাভাষী অঞ্চলে জৈনধর্মের প্রভাব ছিল। জৈন পণ্ডিত সর্বনন্দিন কাঞ্চীতে তাঁর লোক বিভাগ গ্রন্থ রচনা করেন।

গুপ্তযুগের সাহিত্য, শিল্প উচ্চ শ্রেণীর রুচির উপযোগী ছিল। সংস্কৃত ভাষা ছিল এই সাহিত্যের বাহন। কোশাম্বি সংস্কৃত ভাষা কেন গুপ্ত যুগে ব্যবহার করা হয় তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন (আগে সুবর্ণযুগ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কোশাম্বি মনে করেন যে, নতুন

সাহিত্য

উৎপাদন ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্যেই সংস্কৃতের আদর বাড়ে। উচ্চশ্রেণী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সাধারণ লোক থেকে নিজেদের পার্থক্য রাখার জন্যে এবং নবোদিত ধনীরা এই উচ্চতর সমাজে স্থান পাওয়ার জন্যে সংস্কৃত ভাষাকে উচ্চশ্রেণীর ভাষা হিসেবে আঁকড়ে ধরেন। লোকের মুখের ভাষা প্রাকৃত আড়ালে পড়ে

Scanned with CamScanner

যায়। অলঙ্কার-বহুল, ব্যাকরণ-কণ্টকিত সংস্কৃত তার হা [illegible]

সংস্কৃত ভাষাকে শব্দ ও ব্যাকরণের কঠিন নিয়মে বাঁধার ফলে এই ভাষার পরিবর্তনশীলতা, গভীরতা ও মানবতা প্রকাশের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। শব্দের অর্থকে চিরন্তন মনে করায় অন্য অর্থে সেই শব্দকে ব্যবহার করে তার ব্যাপকতা ও ব্যঞ্জনা বাড়াবার ক্ষেত্র সীমিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্য এজন্য বিশেষভাবে দুর্বল। সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থের বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ। জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় রচনার অভাব চোখে পড়ার মত। উচ্চ শ্রেণীর জন্যে বিনোদন-মূলক সাহিত্য সংস্কৃতে বহু রচিত হয়েছে। ধর্ম ও দর্শনেও গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু স্থাপত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য এবং প্রয়োগ বিজ্ঞানের ওপর সংস্কৃত গ্রন্থ বিশেষ নেই। কারণ সংস্কৃত গ্রন্থ যাঁরা রচনা করতেন এবং যাঁদেব জন্যে রচিত হত তাঁরা ছিলেন অভিজাত ও উচ্চকোটির লোক। সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্য রচনা বেশী নেই এবং কাব্যের তুলনায় গদ্য রচনা দুর্বল। সবল গদ্য ছাড়া কোন মননশীল রচনা সৃষ্টি করা কঠিন।

কালিদাস

গুপ্ত যুগের তথা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকার ছিলেন মহাকবি কালিদাস। কিংবদন্তী অনুসারে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার উজ্জ্বলতম রত্ন। কালিদাস গুপ্ত যুগে জীবিত ছিলেন কিনা এ নিয়ে নানা রকম মত প্রচলিত আছে। (ক) অনেকে বলেন যে, তাঁর বচনায় বিক্রমাদিত্যের কথা জানা যায়। এই রাজা বিক্রম সম্ভবতঃ উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য। কিংবদন্তী অনুসারে ইনি প্রথম খ্রীঃ পূঃতে জীবিত ছিলেন। সুতরাং কালিদাস খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতকের লোক। তিনি সম্রাট অগ্নিমিত্রের কথাও বলেছেন তাঁর মালবিকা-অগ্নিমিত্র নাটকে। সুতরাং তিনি সম্ভবতঃ শুঙ্গ রাজাদের সমকালীন ছিলেন। (খ) বেশীর ভাগ লেখকের মতে, কালিদাস ছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন। কালিদাসের টীকাকার মল্লিনাথের টীকায় দিন্নাগাচার্যের উল্লেখ আছে। দিন্নাগাচার্য ছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক। এই কারণে কালিদাসকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন ধরা হয়। তাছাড়া দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি ছিল বিক্রমাদিত্য। এর সঙ্গে রাজা বিক্রমের নাম কিংবদন্তীতে জড়িয়ে যায়। (গ) ডঃ অশোক শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বলেন যে, কালিদাস সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন। কারণ তাঁর রঘুবংশম্ মহাকাব্যে রঘুর দিগ্বিজয়ের যে বর্ণনা দেওয়া আছে তা প্রায় সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের বর্ণনার অনুরূপ। কালিদাস, সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত উভয়ের সমকালীন ছিলেন। উভয়ের বিজয়কে অবলম্বন করে তিনি রঘুবংশম কাব্যে রঘুর দিগ্বিজয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। এই মতের একটা বড় ত্রুটি এই যে, এতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে শক-ক্ষত্রপদের যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়া হয়নি। কিন্তু এমনও হতে পারে যে, শক যুদ্ধের আগেই কালিদাস তাঁর কাব্যটি রচনা করেন। এখন বেশীর ভাগ পণ্ডিত কালিদাসকে সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক বলে মনে করেন।

অন্যান্য সংস্কৃত রচনা

কালিদাসের রচনার সমালোচকদের মতে শ্রেষ্ঠ দিক হল উপমার ব্যবহার। কিন্তু এ কথা সর্বাংশে সত্য নয়। কালিদাসের ভাবগৌরব কম নেই। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় কালিদাস যে বিষণ্ণ ও করুণ ভাবের অবতারণা করেছেন তার তুলনা খুব কম। কালিদাসের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির মধ্যে অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, রঘুবংশম্, মেঘদূতম, কুমারসম্ভবম্, মালবিকাগ্নিমিত্রম্ প্রভৃতি বিখ্যাত। কালিদাস তাঁর মেঘদূতম্ মহাকাব্যে অনবদ্য একশতটি শ্লোকে তাঁর ভাব প্রকাশ করেছেন। তিনি মেঘকে দূত হিসেবে ব্যবহার করে তাঁর কাব্য বিরহী যক্ষের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছেন। সমগ্র কাব্যটি মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত। কালিদাসের রচনা পড়ে মনে হয় যে, দর্শন শাস্ত্র, সাংখ্য, যোগ, নাট্য শাস্ত্র, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। প্রকৃতি ও মানুষকে তিনি ভালভাবে অনুধাবন করেন। বিভিন্ন

ক্ষেত্রে মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতি তিনি বিশ্লেষণে পারদর্শী ছিলেন। মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটকে কালিদাস ঐতিহাসিক কাহিনী ব্যবহার করেছেন। অন্য নাটক ও কাব্যে তিনি পৌরাণিক কাহিনী ব্যবহার করেছেন। কালিদাস ছাড়া গুপ্ত যুগের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকার ছিলেন মুদ্রারাক্ষস নাটকের রচয়িতা বিশাখদত্ত, মৃচ্ছকটিকম্ নাটকের রচয়িতা শূদ্রক, কীরাতঅর্জুনীয়মের রচয়িতা ভারবি। ভারবি সঠিকভাবে গুপ্তযুগের কবি না হলেও গুপ্তযুগের ভাবধারায় তাঁর কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্য অর্থগৌরবের জন্যে বিখ্যাত। খ্রীঃ ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি তিনি জীবিত ছিলেন বলে মনে করা হয়। বিশাখদত্তের নাটকে মুদ্রারাক্ষস ও দেবীচন্দ্রগুপ্তম্ ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে কাজে লাগে। এছাড়া সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণ, চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী বীরসেনও ছিলেন কবি। সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যের গুপ্ত যুগে বিশেষ উন্নতি হয়। বিষ্ণুশর্মা বিখ্যাত পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী রচনা করে। দণ্ডিন ছিলেন সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রূপকার। তিনি তাঁর দশকুমার চরিত ও কাব্যাদর্শ অনবদ্য গদ্যে রচনা করেন। দণ্ডিনের রচনায় সমাজের নিম্নবর্গের মানুষদের কথা জানা যায়। তিনি লোকচরিত্র অত্যন্ত নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেন। গুপ্তযুগের ভাষায় সুবন্ধু তাঁর বাসবদত্তার কাহিনী রচনা করেন। তাঁর রচনায় আড়ম্বরপূর্ণ, অলঙ্কার-বহুল বাক্যের ব্যবহার বেশী দেখা যায়। অমরসিংহ ছন্দাকারে সংস্কৃত অভিধান অমরকোষ রচনা করেন। গুপ্তযুগে ব্যাকরণে চন্দ্র যোমিন ও জিনেন্দ্র বিশেষ খ্যাতি পান।

বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিদ্যার ক্ষেত্রে গুপ্তযুগের মনীষা পিছিয়ে ছিল না। বাগভট্ট তাঁর চিকিৎসা বিদ্যার বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। অনেকে বলেন, বাগভট্ট নামে দুইজন ব্যক্তি ছিলেন এবং এঁরা দুজনি চিকিৎসা গ্রন্থ লেখেন যথা অষ্টাঙ্গসংগ্রহ, অষ্টাঙ্গ-হৃদয়-সংহিতা। বিখ্যাত বরাহমিহির তাঁর পঞ্চসিদ্ধান্ত গ্রন্থ রচনা করে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দিক-নির্ণয় করেন। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানকে তিন শাখায় ভাগ করেন, যথা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত ও জ্যোতিষ। অবশ্য জ্যোতিষকে বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত কিনা এ নিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা প্রশ্ন তুলেছেন। বরাহমিহিরের রচনায় গ্রীক ও রোমান জ্যোতির্বিজ্ঞানের ছাপ ঐতিহাসিক স্মিথ লক্ষ্য করেছেন। অন্ততঃপক্ষে গ্রীক ও রোমান জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল এতে সন্দেহ নেই। গুপ্ত যুগের নিউটন ছিলেন পণ্ডিত আর্যভট্ট। তাঁর আর্যভট্টীয় নামে গ্রন্থ এক অসাধারণ মৌলিক রচনা। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। এভাবে তিনি আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি আবিষ্কার করেন। তিনি সৌরবর্ষের দিন হিসেব করে দেখান যে, ৩৬৫, ৩৫৮, ৬৮০ সৌর দিনে এক সৌরবর্ষ হবে। বথামের মতে, গুপ্তযুগে গণিত চর্চা এক অসাধারণ উচ্চতায় পৌছায়। অঙ্ক শাস্ত্রের উন্নতির জন্যে ভারতবাসী গৌরব অনুভব করতে পারে।

গুপ্ত যুগে দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে অসাধারণ অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মতে, গুপ্ত যুগে দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে বহু মৌলিক তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতীয় দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের রচনার স্বর্ণযুগ বলতে গুপ্ত যুগকেই বলা চলে। ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর সাংখ্যকারিক রচনা করে সাংখ্যদর্শনের টীকা রচনা করেন। আসঙ্গ নাগাচার শাস্ত্র রচনা করেন। বসুবন্ধু রচনা করেন পরমার্থ সপ্ততি। পক্ষিল স্বামিন ন্যায়-সূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। দিন্নাগাচার্য বৌদ্ধ দর্শনের ব্যাখ্যা করেন। প্রমাণ-সমুচ্চয় নামে এক বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থও এই মহাপণ্ডিত রচনা করেন। শঙ্করের গুরু গৌড়পাদ তাঁর অদ্বৈতবাদ ও বেদান্তবাদ তত্ত্ব প্রচার করেন। ধর্মীয় সাহিত্যে বৃহস্পতি নারদ-স্মৃতি, দেবল স্মৃতি প্রভৃতি কয়েকটি স্মৃতিশাস্ত্র গুপ্তযুগে রচিত হয়। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে কয়েকটি পুরাণ গুপ্ত যুগে পুনর্লিখিত হয়। হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠানে এবং

Scanned with CamScanner

চিন্তাধারায় যে পরিবর্তন আসে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্যে কয়েকটি পুরাণের পুনর্লিখন করা হয়। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মকে পুরাণে স্থান দিয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে তাঁর অন্তর্ভুক্তি করা হয়। পুরাণ ছিল এই নতুন সমন্বয়কারী ধর্মসাহিত্য। এর ফলে বৈষ্ণব বা শৈবরাও কিছু কিছু বেদাচার মানেন। তাছাড়া কাত্যায়ন, দেবল স্মৃতি হয়ত গুপ্ত যুগের কিছু আগে রচিত হয়। পরাশর স্মৃতি গুপ্ত যুগের রচনা। সম্ভবতঃ, মহাভারতেরও পুনর্লিখন গুপ্ত যুগে হয়েছিল।

গুপ্ত যুগের শিল্পকলা (Art and Architecture in the Gupta Age) ঃ ভিনসেন্ট স্মিথ মন্তব্য করেছেন যে, "স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা এই তিনটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত শিল্পকলার অসাধারণ বিকাশ গুপ্তযুগে ঘটেছিল।"[১] গুপ্ত যুগের মনীষা যেন সহস্র শাখায় বিকশিত হয়ে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্পের ডালিকে ভরিয়ে দেয়। শিল্পের ক্ষেত্রে

গুপ্ত শিল্পকলার প্রকৃতি

গুপ্ত যুগের অগ্রগতি তার সাহিত্যিক অগ্রগতির মতই বিস্ময়কর ছিল। গুপ্ত যুগে স্থাপত্য শিল্পের নতুন যুগ আরম্ভ হয়। আগের যুগের স্থাপত্য ধারার সঙ্গে গুপ্ত যুগের নব ধারা মিশিয়ে তাকে এক বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়। এই বৈশিষ্ট্যের ছাপ দেখা যায় গুপ্ত যুগের গুহামন্দিরগুলির নির্মাণ কৌশলে। অজন্তা, ইলোরা, বাঘ গুহার নির্মাণে পাহাড় কেটে চৈত্য ও বিহার তৈরির কৌশল গুপ্ত যুগে আবিষ্কার করা হয়। অজন্তায় মোট ২৮টি গুহার মধ্যে পাঁচটি গুপ্ত পূর্ব যুগের বলে মনে করা হয়। বাকি ২৩টির মধ্যে ২১টি বৌদ্ধ

অজন্তার শিল্প ভাস্কর্য

বিহার এবং ২টি চৈত্য। এই গুহাগুলিকে এখন ক্রমিকভাবে নম্বর যুক্ত করে উল্লেখ করা হয়। ২৬ নং গুহা চৈত্যটি বেশ প্রশস্ত ও ভাস্কর্যমণ্ডিত এবং একটি বুদ্ধমূর্তি ঝোলান পা-যুক্ত অবস্থায় তৈরি করা হয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য ভঙ্গিমায় বসা অথবা দাঁড়ানো বুদ্ধমূর্তিও এই গুহায় আছে। পাথর কেটে ভাস্কর্যের কাজ বেশ উচ্চমানের। অজন্তার বিহারগুলির মধ্যে ১১ নং গুহা বিহার সম্ভবতঃ প্রাচীনতম। এই গুহার কেন্দ্রে একটি প্রশস্ত কক্ষ বা হল ঘর চারটি থামের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ১, ২, ১৬, ১৭ নং গুহায় দেওয়ালের চিত্রশিল্প জগৎ-বিখ্যাত। যদিও চিত্রগুলি ধর্মীয় বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত, কিন্তু নরনারীর দৈহিক সৌন্দর্য এবং মানসিক ভাবের অসাধারণ প্রকাশ এই সকল চিত্রে দেখা যায়। ১, ২, ১৬, ১৭, ১৯ নং গুহার চিত্রের অনেকগুলি এখন ধ্বংস হয়ে গেছে। বুদ্ধের জীবন কাহিনী ও জাতকের গল্প নিয়ে প্রধানতঃ চিত্রগুলি আঁকা। পশু, পাখি, রাজা, রাজপ্রাসাদ, কৃষক পূর্ণভাবে এখানে উপস্থিত। এখানে বোধিসত্ত্ব পদ্মপানি অবলোকিতেশ্বরের ত্রিভঙ্গ মূর্তির চিত্রটিকে অনেক সমালোচক সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। মূর্তির মাথায় হীরা-মুক্তা খচিত মুকুট, মুখে বেদনার করুণাঘন প্রকাশ, দৃষ্টিতেও করুণা ও বেদনা ঝরে পড়ছে। দৃষ্টি অবনত। মূর্তিটি একটি তরুণ যুবকের শরীর নিয়ে চিত্রিত। বোধিসত্ত্বের ভাবে মহাযান শাস্ত্রে বলা হয় যে, জগত বাসীকে দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে তিনি ত্রাণ করবেন। এই মূর্তিতে মনে হয় মানুষের বেদনার তিনি অংশভাগী। আর একটি চিত্রও বিখ্যাত। ভিক্ষুবেশে বুদ্ধ তাঁর পূর্বাশ্রমের পত্নী গোপা ও পুত্র রাহুলের কাছে ভিক্ষা চাইছেন।

মধ্যপ্রদেশে বাঘ গুহার বিহারে ৯টি গুহা আছে। এই বিহারের কেন্দ্রীয় কক্ষের আয়তন ১৯ বর্গফুট। এই বিহারে ভাস্কর্যমণ্ডিত একটি বারান্দা আছে যা এই বিহারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বাঘ গুহার বারান্দার দেওয়ালে চিত্রশোভা দেখা যায়। চিত্রশৈলী অনেকটা অজন্তার ধরনে এবং বিষয়বস্তু বুদ্ধের জীবন কাহিনী। যেখানে অজন্তার চিত্রগুলি নিরাসক্তি ও বৈরাগ্যের সুরে বাঁধা

১· "The three closely allied arts of architecture, sculpture and painting attained extraordinary high points of achievements".

Scanned with CamScanner

...র গুহার চিত্রগুলি অনেক বেশী পার্থিব, মানবিক। বাঘের হাতির শোভাযাত্রার দৃশ্য ...ই বিস্ময়কর। ভূপালের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের গুহা মন্দির উদয়গিরি সমগ্র একটি পাহাড় ... বাইরের দিকে পাহাড় অক্ষুণ্ণ রেখে ভেতরে মন্দির তৈরি করা হয়। গুহার ভেতরের ...দিকে ধরে রাখার জন্যে খোদাই করা থাম রাখা হয়। উদয়গিরির রাণী গুম্ফা গুহাটি ... ভাল অবস্থায় আছে এবং এটিই বৃহত্তম। এই বিহারের থামযুক্ত বারান্দা আছে।

...গুপ্ত যুগে মন্দির স্থাপত্যের বিশেষ শৈলী রচিত হয়। গুপ্ত যুগের আগে কোন হিন্দু মন্দিরের ...বশেষ দেখা যায়নি। একমাত্র পাহাড় কেটে গুহামন্দির তৈরি করা হত। মন্দির তৈরির ...ইট, পাথর প্রভৃতি স্থায়ী উপকরণ এর আগে ব্যবহার হত না। গুপ্ত যুগেই সর্বপ্রথম পাথর বা ইঁটের তৈরি মন্দির নির্মাণ আরম্ভ হয়। মন্দির নির্মাণের জন্যে এক বিশেষ স্থাপত্য শৈলী আবিষ্কৃত হয়। প্রতি মন্দিরের তিনটি অংশ থাকত।

...র স্থাপত্য

...) সিংহ দরজা পার হয়ে প্রশস্ত অঙ্গন;(২) অঙ্গনের পর নাটমন্দির, যেখানে ভক্তজন ...বেত হত; (৩) গর্ভগৃহ, যেখানে বিগ্রহ অধিষ্ঠিত থাকত। গর্ভগৃহকে নিয়ে যে মন্দির তা ...মন্দিরের সঙ্গে প্রশস্ত অলিন্দ দ্বারা সংযুক্ত থাকত। মন্দিরের চত্বরের চতুর্দিকে প্রশস্ত উঠান ...প্রাচীর থাকত। গুপ্ত যুগের মন্দিরের এই স্থাপত্য শৈলী মোটামুটি এখনও চালু আছে। গুপ্ত ...ই সর্বপ্রথম মন্দিরের চূড়া উচু করে তৈরি করার চলন হয়। গঠনভঙ্গির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ...নুযায়ী অধ্যাপক সরসী কুমার সরস্বতী গুপ্তযুগের মন্দিরগুলিকে পাঁচভাগে ভাগ করেছেন, ...—(১) সমতল ছাদের বর্গক্ষেত্র মন্দির ও মণ্ডপ। যথা সাঁচির বিষ্ণু মন্দির, তিগওয়ার বিষ্ণু ...র, এরণের বরাহ মন্দিরের গঠন এই রীতিতে হয়। সাঁচির বিষ্ণুমন্দিরে আলো-ছায়ার সুষম ...ন লক্ষণীয়। (২) সমতল ছাদের বর্গক্ষেত্র মন্দির, কিন্তু গর্ভগৃহের চারপাশে পরিক্রমার জন্যে ...লিন্দ এবং সামনে মন্ডপ, যথা—নচনা-কুঠারার পার্বতী মন্দির, ডুমারার শিবমন্দির, মেগুতির ...ষ্ণুমন্দিরের কথা বলা যায়। (৩) নিচু শিখর যুক্ত বর্গক্ষেত্র মন্দির, যথা দেওগড়ের দশাবতার ...ন্দির, ভিতারগাঁওয়ের ইষ্টক মন্দির, আইহোলের দুর্গা মন্দির। দেওগড়ের দশাবতার মন্দির ...থরের তৈরি ও পাথরের দেওয়ালে ভাস্কর্যের কাজ। এই মন্দিরের শিখর বা ধ্বজা ৪০ ফুট ...চু। মন্দিরটি উঁচু প্রশস্ত বেদী বা দেবী পটের ওপর স্থাপিত। দেওগড়ের মন্দিরের নির্মাণ কাল ...নেকের মতে ষষ্ঠ শতাব্দী। গুপ্ত স্থাপত্যের ছায়ায় এই মন্দির তৈরি হয়। ভিতার-গাঁওয়ের ...ন্দিরের সঠিক সময় জানা যায়নি। ডঃ সরস্বতীর মতে, এই মন্দির গুপ্ত যুগেই তৈরি হয়। ...ভতারগাঁওয়ের মন্দিরে গর্ভগৃহের গায়ে একটি পার্শ্ব প্রকোষ্ঠ দেখা যায় এবং গর্ভগৃহের সঙ্গে ...যোগের পথ আছে। ভিতারগাঁওয়ের মন্দিরের নির্মাণে বুদ্ধগয়ার মহাবোধি বিহারের প্রভাব ...খা যায় বলে তিনি মনে করেন। ভিতরগাঁওয়ের মন্দিরের শিখরটি পিরামিডের মত। (৪) মাঝখানে উঁচু দুধারে ঢালু অর্থাৎ ধনুকের আকারের ছাদযুক্ত আয়তক্ষেত্র মন্দির এবং ...ন্দিরের পিছন দিক অর্ধবৃত্তের মত। সোলাপুরের তের মন্দির এবং কৃষ্ণা জেলার কপোতেশ্বর ...ন্দির এই শ্রেণীতে পড়ে। এই মন্দিরগুলি আয়তনে ছোট। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ চৈত্যগুলিকে মন্দিরে ...পান্তরিত করা হয়। এই মন্দিরগুলির শিল্প স্থাপত্য অকিঞ্চিৎকর। (৫) বৃত্তাকৃতি মন্দির যার ...র কোণে কিছু অংশ বাইরে বেরিয়ে থাকত। মণিনাগের মন্দির এই পর্যায়ে পড়ে। সম্ভবতঃ ৪র্থ ... ৫ম শ্রেণীর মন্দিরগুলিতে গুপ্ত স্থাপত্যের মৌলিক চিহ্ন নেই।

...যাই হোক, গুপ্তযুগের মন্দিরের বৈশিষ্ট্য (১) তার গঠনের মাল মশলা—পাথর, ইট প্রভৃতি ...জবুত ও স্থায়ী দ্রব্যে; (২) তিন মহলা মন্দিরে, (ক) সিংহ দরজা, (খ) মণ্ডপ, (গ) মূল ...ন্দির; (৩) মন্দিরের ভেতর অলিন্দ, অঙ্গন পরিক্রমা পথে; (৪) চূড়া বা শিখরে; (৫) সমতল ...ও ঢেউ খেলানো ছাদে দেখা যায়।এই মন্দির স্থাপত্যে দ্রাবিড় রীতি ও নাগর রীতির প্রভাব

লক্ষণীয়। উচ্চ গৃহ নাগর রীতির পরিচয় দেয়। মন্দিরগুলির উপরতলার সঙ্কীর্ণতা দ্রাবিড় রীতির আভাস দেয়। মন্দিরের ভাস্কর্যও দ্রাবিড় রীতির পরিচায়ক।

ভাস্কর্য শিল্প

গুপ্ত যুগের ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত হয়ে, সম্পূর্ণ ভারতীয় শৈলীতে এই ভাস্কর্য এক অসাধারণ শ্রেষ্ঠত্বে পৌঁছে যায়। এ যুগের মথুরা ও অমরাবতীর ভাস্কর্যশৈলী একটি পরিণতিতে পৌঁছে যায়। গন্ধার শিল্প কুষাণ যুগে পূর্ণতা পেয়েছিল এবং তাতে গ্রীক ও রোমান প্রভাব ছিল। গন্ধার শিল্পরীতির স্থূলত্ব ও যান্ত্রিকতা গুপ্ত শিল্পীদের সৃজনীশক্তি অতিক্রম করে যায়। মথুরা শিল্পরীতির পার্থিবতা ও বেঙ্গী বা অমরাবতী শৈলীর ইন্দ্রিয়তা অতিক্রম করে গুপ্ত ভাস্কর্য এক অতিন্দ্রিয় স্তরে পৌঁছে যায়। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ও ডঃ সরসী কুমার সরস্বতী গুপ্ত ভাস্কর্যে এই যুগের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে দেখেছেন। ডঃ রায়ের মতে,সারনাথের বুদ্ধ মূর্তি অথবা গুপ্ত যুগের দেবদেবী মূর্তির গঠনে ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করা যায়। দেবতাদের মূর্তি মনুষ্যাকারে নির্মিত। দেবতার বক্ষ কপাটের ন্যায়, দেব-দেবীর ওষ্ঠাধর মৃদুহাস্যে স্ফুরিত, চক্ষু অর্ধনিমীলিত। হৃদয়ে পরম জ্ঞানের উদয় হলে তবেই এমন হয়। দেবীদের অঙ্গুলি চাঁপা ফুলের ডগার মত ঈষৎ উঁচু, জানু কদলীকান্ডের মত, চক্ষু সফরী বা হরিণের মত, ভ্রূ যুগল বঙ্কিম। ডঃ সরস্বতীর মতে, গুপ্ত যুগের শিল্পীরা তাঁদের রচনায় বাইরের সৌন্দর্যের সঙ্গে অন্তরের ভাবের মিলন ঘটান। এইভাবে শিল্পে অতীন্দ্রিয়তা ও আধ্যাত্মিকতা পরিলক্ষিত হয়। প্রাণী, উদ্ভিদ, মনুষ্য মূর্তি ছিল শিল্পের বিষয়বস্তু। স্নায়বিক উত্তেজনা বাদ দিয়ে শান্ত সমাহিত রূপ-লাবণ্য এই মূর্তিতে বিকশিত। জীবনের গভীরতর ভাবে তা উদ্ভাসিত। শান্ত, সংযমের সঙ্গে মনোভাব প্রকাশের জন্যে বিভিন্ন মুদ্রার ব্যবহার, দেহের বিভিন্ন ভঙ্গিগুলি লক্ষ্য করার মত। মুদ্রায় যেমন হাত ও আঙুলের ব্যবহার দেখা যায়, ভঙ্গে তেমন দেহের দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখা যায়। বুদ্ধগয়ার মথুরা রীতিতে নির্মিত বুদ্ধমূর্তিটি বিশেষ বিখ্যাত। বুদ্ধগয়ার মূর্তি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা জাগায়, সারনাথের বুদ্ধমূর্তি সূক্ষ্মতা ও রুচিবোধের পরিচয় দেয়। এছাড়া কোসমের শিব-পার্বতী রিলিফ, দেওগড়ের মন্দিরে রামায়ণের রিলিফের কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সারনাথের থেকে দেওগড়ের মূর্তিগুলির পার্থক্য এই যে, সারনাথের মূর্তি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন আর দেওগড় পরস্পর সংযুক্ত। সারনাথে বুদ্ধের করুণাঘন, ধ্যানী রূপ প্রকাশ পেয়েছে। এই বুদ্ধ-মূর্তির আধ্যাত্মিকতা বিশেষভাবে প্রকাশমান। মথুরার শিল্পেও এই আধ্যাত্মিকতার ভাব স্পষ্ট। যথা মথুরার কার্তিকেয় মূর্তি বা শিবমূর্তির কথা বলা যায়। দেওগড়ের দশাবতার মন্দিরের অনন্ত শয্যায় বিষ্ণুর রিলিফের কাজ উল্লেখ্য। তবে সারনাথের তুলনায় মাজাঘষা কম ও উজ্জ্বলতা কম। মালবে ভিলসার উদয় গিরিতে বরাহ অবতারের রিলিফ বিশেষ বিখ্যাত। এখানে অরাজকতা ও ধ্বংসের বিরুদ্ধে বরাহরূপী বিষ্ণুর প্রচণ্ড তেজ ও শক্তি যেন ফুটে উঠেছে। এই মূর্তি যেন মানুষের মনে আশা, বিশ্বাস সৃষ্টি করে। ডঃ নীহাররঞ্জনের মতে, এই বরাহ মূর্তি খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের ভাস্কর্যের সঙ্গে খ্রীঃ ষষ্ঠ শতকের বাদামি, ইলোরা ভাস্কর্যের যোগসূত্রের কাজ করছে। গুপ্ত যুগে দাক্ষিণাত্যের ভাস্কর্যে সারনাথের প্রভাব কিছুটা আইহোলের রিলিফ ভাস্কর্যে দেখা যায়। তবে দক্ষিণের নিজস্ব রীতি অনুযায়ী সারনাথের শান্ত,ভাবের সঙ্গে দক্ষিণী নমনীয়,নম্রভাব লক্ষণীয়। কানহেরির গুহা ভাস্কর্যে সারনাথের মৃদু প্রভাব দেখা যায়। সারনাথের তরল, কমনীয়,শান্ত ভাব এখানে অনুপস্থিত বলা যায়। মূর্তিগুলির ভঙ্গি কঠিন। বাদামি গুহার ভাস্কর্যেও ভামা বা কার্লের রীতির পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়।

গুপ্ত চিত্রকলার অভূতপূর্ব বিকাশ অজন্তার গুহার গায়ে দেখা যায়। ১৬ ও ১৭ নং গুহায়

চিত্রকলা

কয়েকটি অসাধারণ চিত্র আছে। গুপ্ত যুগের চিত্রকলা ধর্মীয় বিষয়কে অতিক্রম করে মানুষের জীবনের নানা দিক নিয়ে রচিত হয়। চিত্রগুলিতে বাস্তব জীবনের ছাপ বহুল পরিমাণে দেখা যায়। বুদ্ধের জীবনকে অবলম্বন করেও বহু প্রাচীর চিত্র আঁকা হয়। অজন্তা ছাড়া বাঘ গুহার চিত্রগুলির বর্ণ-সুষমা ও নর-নারীর দৈহিক সৌন্দর্য বিশেষ উল্লেখ্য।

ধাতু শিল্প

গুপ্ত যুগে ধাতুশিল্পের বিকাশও কম উন্নত ছিল না। দিল্লীর মেহেরৌলীতে রাজা চন্দ্রের নামে যে লৌহস্তম্ভ দেখা যায় তাতে কখনও মরিচা পড়েনি। এই স্তম্ভের মসৃণতা ও ঔজ্জ্বল্য দেখে প্রথমে এটি লোহার বলে অনেকে বিশ্বাস করতে পারে না। অধুনা ডঃ ভার্গব নামক প্রত্নতত্ত্ববিদ এই অভিমত দিয়েছেন যে, মেহেরৌলীর লৌহস্তম্ভ ও কুতবমিনার গুপ্তযুগেই তৈরি হয়েছিল। এই মিনারটি মানমন্দির হিসেবে কাজ করত। পরে সুলতানি যুগে ইলতুৎমিস এটিকে কুতবমিনার বলে নামকরণ করেন।[1] এই মত এখন সকল ঐতিহাসিক স্বীকার করেননি। গুপ্ত যুগের তৈরি ব্রোঞ্জ ও তামার মূর্তিগুলিও এ যুগের ধাতুশিল্পের উন্নতির পরিচয় দেয়।

... বিকাশে বৈদেশিক প্রভাব (Impact of foreign

Scanned with CamScanner

ভঙ্গি ও মুখাকৃতি ভারতীয়, কিন্তু পাথর কেটে এরূপ মনুষ্যাকার দেব-দেবী মূর্তি নির্মাণের মধ্যে তিনি গ্রীক প্রভাব দেখতে পেয়েছেন। (৫) অজন্তার চিত্রাবলীতে চীনা অঙ্কনশৈলী কোন কোন চিত্রে বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে। চীনা ধরনের নাক, চোখ, গহনা ও রং-এর ব্যবহার এর সাক্ষ্য দেয়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, গুপ্ত সভ্যতার উপর কিছু কিছু বৈদেশিক প্রভাব পড়েছিল। ভারতীয় সভ্যতা চিরকালই পরকে আপন করে নিতে পেরেছে। এইভাবে কিছু কিছু বৈদেশিক প্রভাবের ভারতীয়করণ হওয়া অসম্ভব নয়। তাছাড়া মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর বৈদেশিক অনুপ্রবেশের ফলে ভারতের বৈদেশিক প্রভাব নিঃসন্দেহে এসে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, গুপ্ত যুগে বাণিজ্যের মাধ্যমে রোমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়। কিন্তু শুধুমাত্র বৈদেশিক সংযোগের ফলেই গুপ্ত যুগের সভ্যতার এতদূর উন্নতি হয় স্মিথের এই মন্তব্য যথার্থ্য নয়। ফুলের বোঁটা ও পরাগ যেমন আসল কিন্তু তার সৌন্দর্য তার পাপড়িতে প্রকাশিত হয়, গুপ্ত সভ্যতার মূল প্রেরণা ছিল ভারতীয়, তাতে কিছু কিছু বৈদেশিক প্রভাব অলঙ্করণের কাজ করে মাত্র। গুপ্ত যুগের সাহিত্য, দর্শন ছিল একান্তভাবে ভারতীয় মনীষার অভিব্যক্তি। গুপ্ত স্থাপত্যও ছিল ভারতীয়। গুপ্ত ভাস্কর্যে অমরাবতী ও মথুরা রীতির মিশ্রণ করে তাকে নবরূপ দান করা হয়। গুপ্ত যুগের রাজনৈতিক ঐক্য, শান্তি ও স্থিতি জনসাধারণের সৃজনশীলতাকে উদ্বুদ্ধ করে। এই সভ্যতার বিকাশে বৈদেশিক প্রভাব কাজ করেছিল এমন কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই।

বৈদেশিক প্রভাবের প্রসারতা বিচার

গুপ্ত যুগের ধর্মমত (Religion in the Gupta Age), :

গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটে বলে স্মিথ্ মন্তব্য করেছেন। তাঁর এই মন্তব্যের কারণ হল গুপ্ত সম্রাটরা মৌর্য সম্রাটদের মত বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেননি। সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। এর থেকে তাঁর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ভগবান বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতির নাম থেকেই বুঝা যায় যে, দেবতা কার্তিকেয় ছিলেন এঁদের আরাধ্য পুরুষ। গুপ্ত রাজাদের মুদ্রায় পদ্মাসনা লক্ষ্মী বা গরুড়াসন বিষ্ণুর মূর্তি খোদিত দেখা যায়। গুপ্ত সম্রাটরা পরম ভাগবত উপাধি নিতেন। এ থেকেও অনেকে তাঁদের বিষ্ণুর প্রতি অনুরাগ লক্ষ্য করেন। তাছাড়া গুপ্ত যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্তম্ভ স্মৃতিশাস্ত্রগুলির বেশীর ভাগ লিখিত হয়। নারদ, ব্যাস, দেবল, বৃহস্পতি স্মৃতি প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রগুলি গুপ্ত যুগে রচিত হয়। অষ্টাদশ পুরাণের পুনর্লিখন করা হয়। বৈদিক যুগ থেকে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের বাহন হিসাবে সংস্কৃত ভাষা চলে আসছিল। গুপ্ত যুগে তা পুনরায় রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা পায়। গুপ্ত সম্রাটদের শাসনকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা ছিল সমাজের শীর্ষস্থানে। জাতিভেদ প্রথার তীব্রতা ছিল। ফা-হিয়েনের রচনা থেকে দেখা যায় যে, চণ্ডাল ও পঞ্চমশ্রেণীদের গ্রাম বা শহরের বাইরে বাস করতে বাধ্য করা হত। নারীদের অবরোধে রাখা হত। পুরুষের আধিপত্যে সমাজ চলত। নারীরা উপনয়ন অথবা বৈদিক শাস্ত্র পাঠের অধিকার হারান। সতীদাহ প্রথার প্রচলন হয়।

গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জাগরণ ঘটেছিল কেন বলা হয়?

অনেকে বলেন যে, গুপ্ত যুগে হিন্দুধর্মের জাগৃতি (Renaissance) ঘটেছিল একথা বলা ঠিক নয়। গুপ্ত যুগে হিন্দুধর্মের পুনর্গঠন (Recreation) হয়েছিল একথা বলাই উচিত। গুপ্ত যুগে যে হিন্দুধর্ম দেখা যায় তার সঙ্গে বৈদিক হিন্দুধর্মের তফাৎ ছিল। বৈদিক দেবতা ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, নাসত্য প্রভৃতি গুপ্ত যুগে উপেক্ষিত হত। তাঁদের স্থলে আসেন লৌকিক দেবতাগণ, যথা, শিব, বিষ্ণু, কার্তিকেয়, গণেশ, উমা-হৈমবতী বা দুর্গা, লক্ষ্মী প্রভৃতি। এঁদের পুজোর জন্যে নতুন বিধি-বিধান ও পদ্ধতি

গুপ্তযুগের হিন্দুধর্মের লৌকিক চরিত্র

Scanned with CamScanner

রচিত হয়। বৈদিক যুগের মত যাগ-যজ্ঞের ব্যবস্থা থাকলেও তার প্রাধান্য কমে যায়। তার স্থলে এই নব দেবতাদের পুজো ও তাঁদের প্রতি ভক্তিই মুক্তির উপায় বলে মনে করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, ভক্তিধর্মের প্রবলতা গুপ্ত যুগ হতে দেখা যায়। ভাগবত বা বৈষ্ণবধর্ম, শৈবধর্ম প্রভৃতি ভক্তিধর্মকে লোকধর্মে পরিণত করে। তৃতীয়তঃ, নতুন দেবতাদের মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্যে পুরাণের সাহায্য নেওয়া হয়। এজন্য গুপ্ত যুগের হিন্দুধর্মকে অনেকে ব্রাহ্মণ্য বা বৈদিক হিন্দুধর্ম না বলে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম বলে থাকেন।

সমন্বয়বাদ ভক্তিধর্ম

গুপ্ত যুগের হিন্দুধর্মকে ডঃ আর. কে. মুখার্জী "পুরাতন ও নতুন ধর্মীয় আদর্শের সমন্বয়যুক্ত বিভিন্ন প্যাটার্ণের মোজাইক" বলেছেন।[1] বৈদিক হিন্দুধর্মের কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠান বজায় থাকলেও, বৈদিক দেব-দেবীর উপাসনা লোপ পায়। গুপ্ত যুগে ত্রিমূর্ত্তি যথা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ঐক্য কল্পনা করা হয়। বৈদিক দেবতা ব্রহ্মার সঙ্গে লৌকিক দেবতা বিষ্ণু ও শিবের মিলন ঘটান হয়। কার্যতঃ ব্রহ্মা অপেক্ষা বিষ্ণু ও শিবেরই জনপ্রিয়তা বাড়ে।

গুপ্ত যুগে যেমন শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের জনপ্রিয়তা বাড়ে তার সঙ্গে শক্তি অর্থাৎ স্ত্রীদেবতার পুজোর জনপ্রিয়তাও বাড়ে। উমা, হৈমবতী, কালী প্রভৃতির পুজো জনপ্রিয়তা পায়। তন্ত্র ধর্মের প্রসারতা দেখা যায়। স্ত্রী-দেবতাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ দেবতাদের স্ত্রীরূপে কল্পনা করা হয়। গুপ্ত যুগে ভক্তিধর্মেরও বিশেষ বিকাশ ঘটে। যদিও বৈদিক যাগযজ্ঞকে ত্যাগ করা হয়নি, তার পাশাপাশি ভক্তিবাদ বিশেষ জনপ্রিয়তা পায়। গুপ্ত যুগে মূর্তিপুজোর ব্যাপক প্রচলন হয়। দেব-বিগ্রহ নির্মাণ এবং মন্দিরে বিগ্রহ স্থাপন করে পুজোর প্রচলন এ যুগে ব্যাপক হয়।

বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মের উদ্ভব

গুপ্ত যুগে কেবলমাত্র হিন্দুধর্মের জাগরণ ঘটে এমন নয়। ফা-হিয়েন বলেছেন যে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মও গুপ্ত যুগে জনপ্রিয় ছিল। গুপ্ত সম্রাটরা ধর্ম-সহিষ্ণুতা নীতি নিয়ে এ সকল ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। গুপ্ত যুগে বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে বহু পরিবর্তন ঘটেছিল। বজ্রযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব এ যুগে হয়েছিল। তারা, অবলোকিতশ্বরের পুজো বৌদ্ধদের মধ্যে আরম্ভ হয়েছিল। বোধিসত্ত্বের উপাসনাও আরম্ভ হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্ম বিশেষ প্রসার লাভ করে।

গুপ্ত যুগের সমাজ ব্যবস্থা ঃ ফা-হিয়েনের বিবরণ (Social life in Gupta Age: Accounts of Fa-hien) ঃ চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন ৪০১-৪১০খ্রীঃ পর্যন্ত গুপ্ত যুগে ভারত পরিভ্রমণ করেন। তাঁর রচনা হতে গুপ্ত যুগের সমাজ সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। ফা-হিয়েন পাটলিপুত্রে তিন বছর এবং তাম্রলিপ্তে দু বছর ছিলেন। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বাংলা ও বিহারে তিনি ভ্রমণ করেন।

জনসাধারণের জীবনযাত্রা

ফা-হিয়েনের মতে, লোকে সুখী ও সন্তুষ্ট ছিল। তারা সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে যেখানে খুশী যেতে পারত। জনসাধারণের নৈতিক মান ছিল উন্নত। ফৌজদারী আইন খুবই মৃদু ছিল। সাধারণতঃ আইনভঙ্গকারীদের দৈহিক শাস্তির পরিবর্তে জরিমানা করা হত। জনসাধারণ সাধারণতঃ নিরামিষ খাদ্য পছন্দ করত। পেঁয়াজ বা রসুন তারা খেত না। কদাচিৎ লোকে মদ্যপান করত। চণ্ডাল প্রভৃতি পঞ্চম শ্রেণী মাংস, মদ্যের অনুরাগী ছিল। তারা নগর বা গ্রামের বাইরে বাস করতে বাধ্য হত।

...ining the religious ideas of both Old a

Scanned with CamScanner

লোকে দাবা, পাশা খেলে, গান, বাজনা বা নাটক অভিনয় করে অবসর কাটাত। জুয়া খেলা ছিল বেশ জনপ্রিয়। এ ছাড়া জীব-জন্তুর লড়াই, কুস্তি, খেলাধূলা, রথের দৌড় প্রভৃতিও জনপ্রিয় ক্রীড়া ছিল। উৎসবের সময় লোকে নতুন পোষাক পরত এবং নানারকম খাদ্য খেত।

খেলাধুলা

গুপ্ত যুগে ব্রাহ্মণদের অগ্রহার ও বৌদ্ধমঠে শিক্ষা দান করা হত। বৌদ্ধ এবং হিন্দু শাস্ত্র ও সাহিত্য সকল বিষয়ই পড়ান হত। বাড়ীতে প্রাথমিক শিক্ষার পর অগ্রহার বা মঠে উচ্চশিক্ষা দান করা হত। সাধারণতঃ দশ বছর উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সন্তানের শিক্ষার জন্যে ব্যয় করত। যারা সন্ন্যাস নিত তারা আরও দীর্ঘকাল পড়াশোনা করত। কাঞ্চি, কাশী, নাসিক প্রভৃতি নগর উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে খ্যাত ছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বিশ্ববিখ্যাত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অসংখ্য পাঠকক্ষ এবং একটি বিরাট পাঠাগার ছিল। দ্বার পণ্ডিতের নিকট প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করলে তবেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া সম্ভব ছিল। বিদ্যার্থী ছাত্রকে এখানে নানা পরীক্ষা দিয়ে যোগ্যতা দেখাতে হত। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রখ্যাত অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন মহাপণ্ডিত ধর্মপাল, কমলশীল, রাহুলভদ্র প্রভৃতি। ভারতের বাইরে চীন ও দূর প্রাচ্যের নানা দেশ থেকে জ্ঞানপিপাসু ছাত্ররা এখানে বৌদ্ধ শাস্ত্র পড়তে আসত। ব্যাকরণ, গদ্য, ছন্দ, অলঙ্কার, তর্কশাস্ত্র, দর্শন, চিকিৎসা ছাড়াও ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপনা এখানে হত। নিগম বা সঙ্ঘগুলিতে ধাতুবিদ্যা, পাথর খোদাই, সোনার অলঙ্কার তৈরি, কাঠের কাজ, হাতীর দাঁতের কাজ শেখান হত। গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র চর্চা হত। আর্যভট্টের গাণিতিক উৎকর্ষই তার প্রমাণ। নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় বিশাল স্থান নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল। এখানে শত শত পাঠকক্ষ ও ছাত্রাবাস ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ নির্বাহের জন্যে গ্রাম দান ও প্রচুর অর্থ দান করা হত।

শিক্ষার ব্যবস্থা

গুপ্ত যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা (The Economic life in the Gupta Age) ঃ গুপ্ত যুগে লোহার পূর্ণ ব্যবহারের ফলে এবং জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতির দরুণ কৃষির বিশেষ উন্নতি হয়। সিন্ধু-গাঙ্গেয়-যমুনা উপত্যকায় লোকবসতি বিস্তর বেড়ে যায়। গুপ্ত যুগে এই কারণে গ্রাম ও বিষয়ভিত্তিক শাসনের প্রাধান্য বেড়ে যায়। জমিগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হত, যথা, (ক) রাষ্ট্রের মালিকানাধীন অকর্ষিত জমি; রাজা কর্মচারীদের এই জমি বেতনের পরিবর্তে দিতেন; (খ) সীতা জমি বা সরকারি মালিকানাধীন কর্ষিত উর্বরা জমি; যার থেকে রাষ্ট্রের প্রভূত অর্থ আয় হত; (গ) ব্যক্তিগত মালিকানার কৃষি জমি; যার থেকে রাজা রাজস্ব বা কর পেতেন। রাজা ব্রাহ্মণদের নিষ্কর জমি দান করতেন; একে অগ্রহার দান বলা হত। আইনতঃ গ্রহীতার মৃত্যু হলে রাজা এই জমি ফেরত পেতে পারতেন। কার্যতঃ গ্রহীতার পরিবার বংশানুক্রমিকভাবে অগ্রহার ভূমিদান ভোগ করত। গুপ্ত যুগে সামন্ত প্রথার অস্তিত্ব ছিল। ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ জমি মালিক, প্রজা বা কৃষকের দ্বারা জমি আবাদ করিয়ে $\frac{১}{২}$ অথবা, $\frac{১}{৫}$ অংশ ফসল নিত, বাকি প্রজা বা কৃষক পেত। সামন্ত প্রথার ফলে কৃষির উন্নতি অব্যাহত ছিল না।

ভূমি ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা

জমিতে ধান, গম, আখ, আম, অন্যান্য ফল, বাঁশ প্রভৃতি জন্মাত। বাংলাদেশ আখ বা গুড় বা চিনির জন্যে বিখ্যাত ছিল। গুড়ের জন্যেই বাংলার নাম গৌড়। ফা-হিয়েনের মতে, পূর্ব ভারতে ধানের চাষ এবং পশ্চিম ভারতে গমের চাষ বেশী হত। জমিতে জলসেচের জন্যে খাল ও নদী বাঁধ বা হ্রদ খোদাই করা হত। স্কন্দগুপ্ত গুজরাটের বিখ্যাত জলসেচের কেন্দ্র সুদর্শন হ্রদের বাঁধ মেরামত করিয়েছিলেন। এছাড়া জলসেচের জন্যে কূপ ও পুকুর খোঁড়া হত। ভারতে কৃষি পণ্যের প্রভূত ফলন হত। বাংলার

জলসেচ ব্যবস্থা

Scanned with CamScanner

পশ্চিম ভারতের গুজরাট ও দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত রপ্তানি হত।

গুপ্ত যুগে বস্ত্রশিল্পের খুবই অগ্রগতি হয়েছিল। বারানসী ছিল রেশম বস্ত্র তৈরির জন্যে বিখ্যাত। মথুরায় কার্পাস বস্ত্র বয়ন করা হত। মসলিন, রেশম সূতী কাপড়, তাঁত কাপড়, পশমের কাপড় প্রচুর পরিমাণে এ যুগে তৈরি হত। চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফলে ভারতের রেশম উৎপাদন ও রেশম রপ্তানি কমে যায়। হূণ আক্রমণের পর এই শিল্পে আরও মন্দা দেখা দেয়। রোমিলা থাপারের মতে, স্থল ও জলপথে চীনা রেশম ব্যাপক আমদানী হলে ভারতীয় রেশম শিল্পে মন্দা দেখা দেয়। তখন একমাত্র ভারতীয় বাজারের ওপর নির্ভর করে রেশম শিল্পকে টিকে থাকতে হয়। তাই দেখা যায় পশ্চিম ভারতের বহু রেশম ব্যবসায়ী তাদের বৃত্তি ও বাসস্থান পরিবর্তন করে। কার্পাস বস্ত্রের তখন একটি বিরাট শিল্প ছিল। দেশের ভেতর এই বস্ত্রের বিরাট চাহিদা ছিল।

বস্ত্র ও রেশম শিল্প

অন্যান্য শিল্পের মধ্যে হাতীর দাঁতের কাজ, পাথর খোদাই, ধাতু শিল্প বিশেষতঃ লোহার কাজ, সোনা, রূপার গহনা তৈরির কাজ প্রভৃতিরও খুব চলন ছিল। এছাড়া কাঠের কাজ, পোড়ামাটির কাজও জনপ্রিয় শিল্প ছিল। গুপ্ত যুগে চর্ম শিল্পের বিস্তার ঘটে। চামড়ার পাদুকার ব্যবহার বাড়ে। এ ছাড়া চামড়ার তৈরি সৌখীন পাখা, বোতল, ঢাকনা প্রভৃতির ব্যবহার আরম্ভ হয়। গুপ্ত যুগের মাটির জিনিষে মাটির সঙ্গে অভ্র মিশিয়ে মাটির পাত্রগুলিকে আকর্ষণীয় করা হত। মণি-মুক্তা খোদাইয়ের সৌখীন কাজ, সোনা-রূপার অলংকারে শিল্পীরা করত। এ যুগে মুক্তার হার বা মুক্তমালার উল্লেখ দেখা যায়।

অন্যান্য শিল্প

গুপ্ত যুগে রাজনৈতিক ঐক্য এবং দেশের সর্বত্র শান্তির জন্যে অন্তর্বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বহির্বাণিজ্যেরও প্রভূত প্রসার ঘটেছিল। কুষাণ যুগ থেকে পশ্চিম ভারতের বন্দরগুলির মাধ্যমে রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে যে বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়, গুপ্ত যুগে তা অব্যাহত ছিল। অনেকে মনে করেন যে, গুপ্ত যুগের অসাধারণ বৈষয়িক সমৃদ্ধির মূলে ছিল রোমান বাণিজ্য। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিম ভারতের শক-ক্ষত্রপদের দমন করার ফলে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকার সঙ্গে পশ্চিম ভারতের বন্দরগুলির প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয়। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গেও গুজরাটের বন্দরগুলির যোগ ছিল। পশ্চিম ভারতের ভৃগুকচ্ছ বন্দর ছিল বহির্বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। এছাড়া কল্যাণ, চৌল, কাবেরীপত্তনম প্রভৃতি বন্দরও ছিল। ওজোন (Ozone) বা উজ্জয়িনী ছিল অন্তর্বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলির সঙ্গে প্রধান যোগসূত্র। উজ্জয়িনীর সঙ্গে রাস্তার দ্বারা গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা সংযুক্ত ছিল। উজ্জয়িনী থেকে ভারুচ বা ভৃগুকচ্ছে মাল রপ্তানি হত। নাসিক, পৈঠান, বারাণসী, তক্ষশিলা প্রভৃতি নগর ছিল বিখ্যাত অন্তর্বাণিজ্যের কেন্দ্র। বাংলার পুণ্ড্রী আখের চিনির কদর সারা ভারতে এমন কি পশ্চিম এশিয়ায় খুব ছিল।

বাণিজ্য

তবে রোমের সঙ্গে গুপ্ত ভারতের বাণিজ্যে শেষ পর্যন্ত মন্দা দেখা দেয়। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, রোমান সাম্রাজ্য দুভাগ হয়ে গেলে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেয়। তাছাড়া পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে হূণ আক্রমণ হলে রোমান বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেয়। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য বা বাইজানটিয়ামের সঙ্গে গুপ্ত ভারতের অবশ্য আরও অনেকদিন বাণিজ্য চলে। খননকার্যের ফলে ভারতের নানাস্থানে বাইজানটাইন মুদ্রার বিপুল সঞ্চয় আবিষ্কৃত হচ্ছে। এর থেকে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের কথা প্রমাণ হয়। পারসীকরা ভারত ও চীন থেকে রেশম কিনে তা রোমান সাম্রাজ্যে রপ্তানি করত। পারসীকরা এত চড়া দামে রেশম বিক্রি করত যে, সম্রাট জাস্টিনিয়ান বাধ্য হয়ে রেশমের দাম বেঁধে দেন। এক পাউণ্ড রেশম ১৮ খণ্ড রোমান

রোমের সঙ্গে বাণিজ্য

স্বর্ণমুদ্রার বেশী দাম হবে না বলে তিনি ফতোয়া জারী করেন। পারসীকদের একচেটিয়া রেশমের ব্যবসা নষ্ট করার জন্যে তিনি আবিসিনীয়দের সাহায্যে ভারত থেকে রেশম আমদানীর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর এই চেষ্টা সফল হয়নি। অবশেষে কয়েকজন খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসী তাদের আলখাল্লার ভাঁজে করে চীন থেকে রেশমের গুটিপোকা লুকিয়ে আনলে রোমে রেশমের উৎপাদন আরম্ভ হয়। এর ফলে রোমে ভারতীয় রেশমের বাজারে মন্দা দেখা দেয়। তাছাড়া হূণ আক্রমণের ফলে ভারতে যে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে তার জন্যেও ৩৬৪ খ্রীঃ থেকে বহির্বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেয়। ভারত থেকে রোমান সাম্রাজ্যে শুধুমাত্র রেশম রপ্তানি হত না। ভারতীয় জীবজন্তু যথা সিংহ, বাঘ, তোতা পাখি, ভালুক প্রভৃতিরও রোমে চাহিদা ছিল। চামড়া, পশুর লোম, হাতীর দাঁতের দ্রব্য, মুক্তা, চন্দন কাঠ, নীল, লোহার জিনিষ, পাথর,সুগন্ধি দ্রব্য ভারত থেকে রপ্তানি হত। এছাড়া রান্নার মশলা, বিশেষতঃ লঙ্কা, মরিচ পশ্চিম দেশে বিশেষভাবে রপ্তানি হত।

রপ্তানি দ্রব্য

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে গুপ্ত ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ কম ছিল না। রোমের সঙ্গে বাণিজ্যে মন্দা দেখা দিলে চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের দ্বারা এই ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করা হয়। বাংলার তাম্রলিপ্ত, ঘণ্টশাল, কাদুরা ও কোরামগুল উপকূলের কাবেরীপত্তনম্ বন্দর থেকে এই বাণিজ্য চলত। তাম্রলিপ্তি তখনকার যুগে এক সমৃদ্ধশালী বন্দর ছিল। দূরপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে তাম্রলিপ্তি থেকে বাণিজ্য চলত। চীনা রাষ্ট্রদূত ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্তি বন্দর থেকে সমুদ্রপথে স্বদেশ যাত্রা করেন। সম্ভবতঃ ফা-হিয়েনের যাত্রাপথ ধরেই ভারত-চীন বাণিজ্য পথ প্রসারিত ছিল। তাছাড়া জাভা, মালয় প্রভৃতি দেশের সঙ্গেও ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য চলত। ভারতের চন্দন কাঠ মেকং নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চল বা ফুনানে রপ্তানি হত। চীন থেকে রেশম আমদানী হত। ইথিওপিয়া থেকে আসত গজদন্ত। ভারতীয় বণিকরা চীনের ক্যান্টন বন্দরে বাস করত। তাছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে মশলা, সুগন্ধি, রেশম এনে ভারতীয় বণিকরা তা রোমে রপ্তানি করত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের সম্পর্কে চীনা বিবরণ পাওয়া যায়। তাম্রলিপ্তি ও দক্ষিণ ভারতের অমরাবতী থেকে ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজ রীতিমত ব্রহ্ম, মালয় ও ফুনানে যাতায়াত করত। ভারতের পশ্চিম উপকূলের কল্যাণ প্রভৃতি বন্দর থেকে আরব ও ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে বাণিজ্য জাহাজ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যেত। যদিও ধর্মশাস্ত্রে সে যাত্রা নিষিদ্ধ ছিল, বাস্তবে তা মানা হত না।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্যে

গুপ্ত যুগে বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণের জন্যে অনেক আইন-কানুন চালু করা হয়। স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে দেখা যায় যে, বাণিজ্যের উন্নতির জন্যে চেষ্টা করা রাজ কর্তব্য বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। গুপ্ত যুগে গিল্ড বা নিগম প্রথা ছিল। বণিকরা তাদের স্বার্থরক্ষার জন্যে নিগম গঠন করত। কারিগররাও নিগম গঠন করত। নিগম প্রথার দরুণ কোন বহিরাগত ব্যক্তি নিগমের বিনা অনুমতিতে বাণিজ্য বা শিল্পের কাজ করতে পারত না। নিগমের নিয়ম অনুসারে জিনিষপত্রের দরদাম স্থির করতে হত। বৃহৎ ব্যবসায়ীরা নিগমগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে একচেটিয়া বাণিজ্য ও মুনাফা করার চেষ্টা করত। এর ফলে পুঁজিবাদের উদ্ভব হয়। গুপ্তরা ধনী শ্রেষ্ঠীদের খাতির করে চলতেন। কারণ তারাই অর্থ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করত, বাণিজ্যকে নিগমের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করত। এজন্য স্থানীয় শাসন পরিষদে নিগম প্রধান ও শ্রেষ্ঠীদের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা হত। নিগমগুলি ছিল স্ব-শাসিত সংস্থা। এতে সরকার হস্তক্ষেপ করত না। নিগমগুলি আধুনিক ব্যাঙ্কের মত মহাজনী কারবার করত। বৌদ্ধ সংঘগুলিও নিগমে টাকা খাটাত ও বাণিজ্যের মুনাফা ভোগ করত। লোকে বাড়তি টাকা নিগমে সুদের বিনিময়ে জমা রাখত। নিগম সেই টাকা চড়া সুদে ব্যবসায়ীদের ধার দিত। সাধারণতঃ ২০% সুদে নিগম টাকা

নিগম প্রথা

Scanned with CamScanner

নিগমগুলি অনেক সময় আধুনিক ব্যাঙ্কের ভূমিকা পালন করত। বড় মন্দিরগুলি এবং পঞ্চায়েতগুলিও সুদের বিনিময়ে অর্থ ঋণ দিত। যদিও ধর্মশাস্ত্রে সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল, ক্ষেত্রে তা মানা হত না। এছাড়া শ্রেষ্ঠী বা শেঠী শ্রেণী ছিল পেশাগত বণিক, পুঁজিবাদী ও প্রধান শ্রেণী। এই শ্রেষ্ঠী শ্রেণী ছিল নিগমগুলির প্রধান।

গুপ্তযুগের মুদ্রাগুলি পরীক্ষার ফলে দেখা যায়, প্রথম দিকে সেগুলি শক-কুষাণদের অনুকরণে তৈরি করা হত। রোমান মুদ্রার প্রভাবের কথা স্মিথ বলেছেন। গুপ্তযুগের শেষদিকে মুদ্রার মানের যথেষ্ট অবনতি হয়। এছাড়া গুপ্ত যুগে রৌপ্যমুদ্রার অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণ লক্ষ্য করে কোশাম্বি গুপ্ত যুগে বাণিজ্যের প্রয়োজন কমে গেছে বলে মনে করেন।

গুপ্ত যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে পণ্ডিতেরা দ্বিতীয় চিন্তা করছেন। তাঁদের মতে, গুপ্ত যুগে দুটি সমান্তরাল অর্থনীতি প্রচলিত ছিল। একদিকে বিশেষ শ্রেণী বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়, বণিক ও শাসক ব্রাহ্মণদের আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই স্বচ্ছল। তারা বিলাসে, আরামে, প্রমোদে সময় কাটাত। নগরের স্বচ্ছল অধিবাসীরাও আরামে, ভোগে ও বিলাসে জীবন কাটাত। বাৎসায়নের কামসূত্র, কামন্দকের নীতিসারে এরূপ বিলাসী নগর জীবনের ছবি পাওয়া যায়। অপরদিকে সমাজের নীচু তলার লোকেদের অবস্থা এরূপ স্বচ্ছল ছিল এমন মনে করা যায় না। পুরাতন নগর যথা, পাটলিপুত্র, রাজগৃহ, শ্রাবস্তি ধ্বংসোন্মুখ হয়েছিল একথা ফা-হিয়েন বলেছেন। স্থলপথে বাণিজ্য পথগুলির গৌরব অস্তমিত হয়েছিল। গুপ্ত যুগে গ্রাম ও জনপদগুলিই প্রাধান্য পেতে থাকে। নগরগুলি ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হচ্ছিল। সম্ভবত: হূণ আক্রমণের পর এই পরিবর্তন দেখা দেয়। সুতরাং ৩৬৪ খ্রীঃ পর গুপ্ত যুগের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লোপ পেতে থাকে।